

মমকান্দীন
চ্যানেঞ্জী
নেতা ও
নেতৃ

ড. মোবারক হোসাইন

মমকান্দীন
চ্যানেঞ্জী
নেতা ও
নেতৃ

সমকালীন চ্যালেঞ্জ নেতা ও নেতৃত্ব

ড. মোবারক হোসাইন

প্রকাশকের কথা

সারা দুনিয়া যেন এখন উত্তপ্ত মরুভূমি । জল ঢেলে দেওয়ার কেউ নেই । আগুন জ্বালানোর লোকের অভাব নেই । মুক্তিপাগল বনি আদম প্রতিনিয়ত বঞ্চনা আর জুলুম-নির্যাতনের মুখোমুখি । নিয়তি ভেবে নীরবতাকেই আপাত দায়িত্ব বিবেচনা করছে তারা । অপেক্ষা করছে কাভারির । কেউ এসে তাদের শিকল খুলে দেবে ।

আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশেও চরম নেতৃত্ব সংকট দৃশ্যমান । জোড়াতালি দিয়ে সব চলছে । পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্য মুখ বেড়িয়ে পড়েছে । সর্বত্রই একটা হাহাকার বিরাজমান । জাতির এই সন্ধিক্ষণে চাই প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব ।

লিডারশিপ নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ একাডেমিক দিক থেকে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করেছেন ড. মোবারক হোসাইন । বাংলাভাষায় নেতৃত্ববিষয়ক একাডেমিক আলোচনা খুবই কম, বিধায় লেখক এ বিষয়ে কলম হাতে তুলে নিয়েছেন । জীবন অভিজ্ঞতা আর গবেষণার নির্যাস জমা করেছেন ‘সমকালীন চ্যালেঞ্জ : নেতা ও নেতৃত্ব’ গ্রন্থে ।

পুরো গ্রন্থটি একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে । সাহিত্যের প্রাণ হয়তো খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, তবে বইটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় নেতৃত্বসংক্রান্ত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তথ্যের সমাবেশ দেখতে পাবেন । আধুনিক রীতি অনুসরণ করে রেফারেন্স বইয়ের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে ।

অনেক পরিশ্রমের ফসল এই গ্রন্থ । আমরা সম্মানিত লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি । বইটির নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ।

নেতৃত্ব বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ বই বাংলা ভাষায় যুক্ত হলো বলে আমাদের বিশ্বাস ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

২৫ এপ্রিল, ২০১৯

লেখকের কথা

Elder L. Tom Perry এক নির্মম সত্য কথা বলে দিয়েছেন- We live in a world that is crying for righteous leadership based on trust worthy Principles.

একুশ শতকের আজকের দিনে এসেও কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। আজকের পৃথিবীতে কী নেই? জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির চরম সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা পরিতৃপ্ত হওয়ার অনেক কিছুই দৃশ্যমান দেখতে পাই। এই ‘অনেক কিছুর’ ভিড়ে আপনি কিছু একটার অভাব দেখবেন। দৃশ্যমান অনেক কিছুর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণের কাজটা করার লোকের বড়ো অভাব। আপনি একটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করলে দেখবেন, মূল সংকট সঠিক নেতৃত্বের। পৃথিবী যেন কোয়ালিটি লিডারশিপের জন্য হাহাকার করছে, অবোরে কাঁদছে। জাহাজে লাখো-কোটি যাত্রী। গন্তব্য পৌঁছার ব্যাকুলতা। অপেক্ষার প্রহর। সবই ঠিক আছে, শুধু জাহাজের নাবিক ঘুমিয়ে। কীভাবে জাহাজ মঞ্জিলে পৌঁছবে বলুন? সময়ের ব্যবধানে সকল যাত্রীসমেত জাহাজ গভীর সাগরে ডুবে যেতে বাধ্য। জলরাশি ক্ষমা করলেও ক্ষুধার জ্বালা ক্ষমা করবে না নিশ্চয়। তিলেতিলে না খেয়ে সমুদ্রে মৃত্যুকে মেনে নেওয়া ছাড়া যাত্রীদের তখন আর উপায় থাকবে না।

আমাদের এই সমাজব্যবস্থার সত্যিকারের পরিবর্তন নিশ্চিত করার মিশনে নামতে চাইলে আপনাকে সর্বপ্রথম সমাজ নামক জাহাজের নাবিক ঠিক করে নিতে হবে। অমানিশার ঘোর কেটে আলোর পথে সমাজকে হাঁটাতে হলে শক্ত ও প্রশিক্ষিত নাবিকের বিকল্প নেই। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে আমাদের অনেক ভালো কিছু কালো হয়ে যাচ্ছে। কোনো কিছু শুরু করার আগে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রথম শর্ত। এই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রথম শর্ত সঠিক নেতৃত্ব।

পৃথিবীব্যাপী এখন লিডারশিপ নিয়ে প্রচুর কাজ হচ্ছে। বিশেষ করে উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে লিডারশিপ কোর্স বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের তরুণরাও এখন লিডারশিপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছে। ব্যক্তি, সমাজ, দল, সংগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে লিডারশিপ ধারণা বিস্তৃত হচ্ছে।

একাডেমিকভাবে আমার লিডারশিপের ওপর পিএইচডি করা সৌভাগ্য হয়েছে। এই সময়ে আমি বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে নেতৃত্ববিষয়ক একাডেমিক কাজ খুঁজেছি। সত্যি বলতে কী হতাশ হয়েছি। মনে হয়েছে বাংলাভাষী মানুষদের জন্য নেতৃত্ব নিয়ে খুব বেশি কাজ হয়নি। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় প্রয়োজনের তাগিদেই নেতৃত্ব সংকট ও চ্যালেঞ্জসমূহ জানার ও বোঝার চেষ্টা করেছি।

একাডেমিক এবং প্র্যাকটিক্যাল দুদিক থেকেই লিডারশিপের ওপর বাংলা ভাষায় একটা মৌলিক গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন অনুভব করেছি। দীর্ঘ দুই বছরের পরিশ্রমের ফসল এই বই। পাঠকবৃন্দের কাছে বিনীতভাবে একটা বিষয় জানিয়ে রাখছি— এই বইটিতে সাহিত্যমানের চেয়ে তথ্যগত দিক নিয়ে বেশি কাজ করা হয়েছে। একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপনা করা হয়েছে।

বইটি রচনার ক্ষেত্রে অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি, সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সময়ের আলোচিত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গার্ডিয়ান পাবলিকেশন বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বইটি আগামীদিনের বাংলাদেশ গড়ার কারিগর তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বগুণ বাড়াতে এতটুকু সহায়ক হলে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সফল হবে।

ড. মোবারক হোসাইন

ঢাকা- ২৫ এপ্রিল, ২০১৯

সূচিপত্র

নেতৃত্বের ধারণা

নেতৃত্বের শাব্দিক অর্থ	১৩
নেতৃত্বের সংজ্ঞা	১৩
নেতৃত্বের বিশ্লেষণী তত্ত্ব	১৪
কে নেতা	১৬
নেতা ও নেতৃত্বের পার্থক্য	১৭
নেতৃত্বের ফলপ্রসূতার উপাদান	১৮
নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা	২১

নেতৃত্বের তত্ত্ব ও কার্যাবলি

নেতৃত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ	২৩
নেতৃত্বের প্রক্রিয়া	২৭
নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য	২৮
একজন সফলকাম নেতার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যিক	২৯
নেতৃত্বের দায়িত্ব	৩১
নেতৃত্বের মূলনীতি	৩৪
নেতৃত্বের দক্ষতার ব্যবহার	৩৫

পরিকল্পনা গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

পটভূমি	৩৬
পরিকল্পনার সংজ্ঞা	৩৭
পরিকল্পনার প্রকারভেদ	৪০
পরিকল্পনা যেসব কারণে ব্যর্থ হয়	৪০
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কী	৪২
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপ	৪৩
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সমস্যা	৪৫
সমস্যা সমাধানের উপাদান	৪৬
সিদ্ধান্ত যাচাই বা পরীক্ষা পদ্ধতি	৪৭
বাস্তবায়ন কী ও বাস্তবায়নের উপাদানসমূহ	৪৮
বাদশা এবং তার মধুর দিঘী	৪৯
সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় দিকসমূহ	৫০
সমস্যা সমাধানে লক্ষণীয় দিকসমূহ	৫১
সৃজনশীল পদ্ধতি	৫২

নেতৃত্বের বৈচিত্র্য

বস বনাম নেতা	৫৩
৩৬০ ডিগ্রি নেতৃত্ব	৫৪
মূল ধারণা	৫৫
নেতৃত্ব এবং আবেগ	৫৫
গোল্ডেন রুল	৫৬
স্যান্ডউইচ-সমালোচনা নীতি	৫৭
পেরেটো ৮০/২০ নীতি	৫৮
নেতৃত্বের দক্ষতা বাড়াতে TAP নীতি	৫৮
৭০-২০-১০-এর নীতি	৫৯
৯০/১০ নীতি	৬০
২০-৬০-২০ নীতি	৬১
পিটার নীতি	৬২
আত্মোন্নয়নের জন্য তেলাপোকা তত্ত্ব	৬৩
শ্রেষ্ঠত্বের জন্য উদ্ভিগ্নতা	৬৪

সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী নেতৃত্ব

সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন	৬৫
সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন প্রক্রিয়া	৬৬
কৌশলী গঠনশৈলী সম্পর্কে ধারণা	৬৭
একটি দলের ভেতরে সৃজনশীলতার চর্চা কীভাবে বজায় রাখা যায়	৬৯
সৃজনশীল নেতাদের স্বতন্ত্র আচরণ	৭০
উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন নেতাদেরকে সনাক্ত করার উপায়	৭১
দৃষ্টান্তমূলক নেতার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন	৭২
নেতা নির্বাচন পদ্ধতি	৭৪

নেতৃত্বের সংকট ও সমাধান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে নেতৃত্ব সংকট	৭৭
বাংলাদেশে নেতৃত্বের চর্চা	৭৯
বাংলাদেশের নেতৃত্ব উন্নয়নের সমস্যা	৮০
বাংলাদেশে সাংগঠনিক নেতৃত্বের দুর্বলতা	৮১

বাংলাদেশের নেতৃত্বের উন্নয়নের করণীয়	৮২
বাংলাদেশে সাংগঠনিক নেতৃত্বের শক্তি	৮৩
নেতৃত্ব সমস্যা বা বাধা সৃষ্টিকারী উপকরণসমূহ	৮৪

বৈশ্বিক নেতৃত্ব ও চ্যালেঞ্জ

বিশ্বায়ন কী	৮৮
বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব কী	৮৯
বৈশ্বিক নেতৃত্ব বিষয়ক কার্যক্রম	৮৯
নেতৃত্বে গতিশীলতা	৯০
বৈশ্বিক নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জসমূহ	৯১

ইসলামে নেতৃত্বের ধারণা

ইসলামে নেতৃত্বের পটভূমি	৯৩
ইসলামে নেতা ও নেতৃত্বের পরিচয়	৯৪
ইসলামি নেতৃত্বের মৌলিক ভিত্তিসমূহ	৯৫
ইসলামি নেতৃত্বের গুরুত্ব	৯৬
নেতৃত্বের উপাদান	৯৯
ইসলামি নেতার বৈশিষ্ট্য	১০০
ইসলামি কর্মীবাহিনীর বৈশিষ্ট্য	১০২
ইসলামি মনীষীদের দৃষ্টিতে নেতার গুণাবলি	১০৪
ইসলামি নেতৃত্বের ধরন	১০৫
ইসলামি নেতৃত্বের ব্যক্তিগত আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ	১০৬

ইসলামি নেতৃত্বের মানদণ্ড ও মূলনীতি

সফল নেতার মানদণ্ড	১১২
ইসলামি নেতৃত্ব উন্নয়নের মানদণ্ড	১১৪
ইসলামি নৈতিকতার ভিত্তি	১১৬
নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিকসমূহ	১১৭
ইসলামি নেতৃত্বের পরিধি	১১৭
ইসলামি নেতৃত্বের কার্যাবলি ও দায়িত্ব	১১৮
ইসলামি নেতৃত্বের কার্যকর নীতিমালা	১১৯
নেতৃত্বের নিপুণতা নিরূপণ	১২১

আদর্শ নেতৃত্বের মাপকাঠি নিরূপণ মডেল	১২২
ইসলামি শাসন	১২৩
নেতৃত্ব পরিচালনায় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি	১২৫
ইসলামি নেতৃত্বের গুণাবলি ও মডেল	
নেতৃত্ব থেকে মুসলমানদের বিচ্যুতির কারণ	১২৮
অধস্তনদের প্রতি নেতার করণীয়	১২৯
মানুষ তাদের নেতাকে যেমনটি দেখতে চায়	১৩১
সামাজিক, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক গুণাবলি	১৩১
ইসলামি নেতৃত্বের বর্জনীয় দিক	১৩৫
ইসলামি নেতৃত্বের মডেল	১৩৭
ইসলামি নেতৃত্বের তত্ত্ব	১৩৯
পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আম্বিয়ায় বর্ণিত নবিদের গুণাবলি	১৪০
ক্যারিশম্যাটিক ও সফল নেতৃত্বের চাবিকাঠি	
ক্যারেশমেটিক লিডার	১৪১
ক্যারিশম্যাটিক লিডারের বৈশিষ্ট্য	১৪২
আদর্শ নেতৃত্বের মূলনীতি	১৪৩
নেতৃত্বে সফলতার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা উচিত	১৪৪
অনুসারীদের ব্যাপারে জানুন	১৪৫
সফল নেতৃত্বের চালিকাশক্তি	১৪৭
সাফল্য লাভের পাথেয়	১৫০
সাফল্যের জন্য পঞ্চকোণ বা পেন্টাগন	১৫২
নেতৃত্বদানে সফলতার বিধিমালা	১৫৩
নেতা যেভাবে কথা বলবেন	১৫৫
সাফল্য অর্জনের কৌশল	১৫৫
বিশ্ব নেতৃত্বের মডেল যারা	
নবি-রাসূলদের নেতৃত্বের গুণাবলি	১৫৭
হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নেতৃত্ব	১৫৮
নেতৃত্বের শিক্ষা	১৬২

খোলাফায়ে রাশেদার নেতৃত্বের গুণাবলি	১৬৩
১. হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)	১৬৩
২. হজরত উমর (রা.)	১৬৪
৩. হজরত উসমান (রা.)	১৬৫
৪. হজরত আলি (রা.)	১৬৬
৫. উমর ইবনে আব্দুল আজিজ	১৬৬
বিশ্বের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নেতা	১৬৭
ইমাম গাজালি	১৬৭
ইমাম ইবনে তাইমিয়া	১৬৮
জর্জ ওয়াশিংটন	১৬৯
আব্রাহাম লিংকন	১৭০
নেলসন ম্যান্ডেলা	১৭১
বারাক ওবামা	১৭২
এপিজে আবদুল কালাম	১৭৩
মাহাথির মোহাম্মদ	১৭৪
রেজেপ তাইয়েপ এরদোয়ান	১৭৫
সাইয়েদ কুতুব (রহ.)	১৭৭
মাহমুদ আহমেদিনেজাদ	১৭৮
উপসংহার	১৮০
Reference	১৮২
সহায়ক গ্রন্থাবলি	১৮৬

নেতৃত্বের ধারণা

নেতৃত্বের শাব্দিক অর্থ

ইংরেজি ‘Lead’ শব্দ হতে ‘Leadership’ শব্দটি এসেছে, যার বাংলা অর্থ নেতৃত্ব। ১৮২১ সালে প্রথম ‘Leadership’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ‘Lead’ শব্দের অর্থ পথ দেখানো (To Guide), চালিত করা (To Conduct), আদেশ করা (To Command), প্ররোচিত করা (To Procure), নির্দেশনা দান (To Direct) ইত্যাদি।

নেতৃত্ব হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো ব্যক্তি বা দলকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করা। নেতৃত্ব মূলত এমন কৌশল, যেখানে দলীয় সদস্যরা তাদের সম্ভাব্য সর্বাধিক সামর্থ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তৎপর হয়।

নেতৃত্বের সংজ্ঞা

নেতা ঠিক দক্ষ নাবিকের মতো। দক্ষ নাবিক ছাড়া যেমন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না, তেমনি দক্ষ ও সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া লক্ষ্য অর্জন করাও সম্ভব হয় না। নেতৃত্ব হলো কোনো দল বা গোষ্ঠীর কাজকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে নিয়ে উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টা। যিনি এ দায়িত্ব পালন করেন, তাকে নেতা (Leader) বলে। নেতৃত্ব হচ্ছে, একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে জনগণকে নির্দেশনা দানের একটি শৈল্পিক প্রক্রিয়া বিশেষ। নেতৃত্বের মাধ্যমে জনগণের স্বতঃপ্রণোদিত আনুগত্য, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা অর্জন করা হয়।

নেতৃত্ব সম্পর্কে একটি চমৎকার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে কম বয়সে দায়িত্ব নেওয়া প্রেসিডেন্ট, থিওডোর রুজভেল্ট (১৮৫৮-১৯১৯); যিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এবং রচনা করেছেন ৩৫টি মৌলিক বই। তিনি বলেছেন,

‘তিনিই শ্রেষ্ঠ নেতা, যিনি কাঙ্ক্ষিত কাজের জন্য উপযুক্ত ও যোগ্য লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেন এবং কর্মীদের কাজে অযাচিত হস্তক্ষেপ না করার ব্যাপারে আত্মসংযমীর পরিচয় দেন।’

নেতৃত্ব এমন একটি গতিশীল কৌশল, যা অধস্তনদের বৈশিষ্ট্য ও মন-মেজাজকে সামনে রেখে তাদের এমনভাবে পরিচালিত করে, যেন সবাই আস্থার সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলীয় ও সাংগঠনিক

উদ্দেশ্য অর্জনে তৎপর হয়। নেতৃত্ব শুধু জনপ্রিয়তা বা কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার দক্ষতা ও কৌশলের ওপরও। Goffee এবং Jones যথার্থই বলেছেন,

‘Leadership should not be judged by its popularity but by its effectiveness’. (Goffee & Jones, 2006)

সময়ের সাথে সাথে নেতৃত্বের কাঠামো, ধারণা এবং পরিধি পরিবর্তিত হয়েছে এবং দিনে দিনে তা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। এই প্রজন্মের তরুণদের নেতৃত্বের সমীকরণ বা Function উপস্থাপন জেনে নেওয়া দরকার।

$$L = f(l.f.s)$$

L = leadership (নেতৃত্ব), f = Function (কার্যাবলি), l = leader (নেতা), f = followers (অনুসারী), s = situation (অবস্থা)

নেতৃত্বের বিশ্লেষণী তত্ত্ব

‘Leadership’ শব্দটি বিশ্লেষণ করলে এর ১০টি বর্ণ থেকে নেতৃত্বের ১০টি বৈশিষ্ট্য জানা যায়।

L-Long Term Vision (দীর্ঘমেয়াদি ভিশন) : একজন দক্ষ নেতার অবশ্যই সুদূরপ্রসারী ভিশন ও মিশন থাকতে হবে। তিনি অদূরদর্শিতামূলক কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। অবগত থাকবেন নিজের গন্তব্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে। সেই লক্ষ্য অর্জনে একদিকে যেমন নিজে কাজ করবেন, অন্যদিকে সেই স্বপ্ন ও বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দেবেন সবার মাঝে।

E-Expertise (পারদর্শিতা) : যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। দক্ষতা অর্জন করতে হলে নেতাকে অবশ্যই বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। হঠাৎ করে কেউ নেতা হয়ে উঠতে পারে না (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে); দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। সময়ের সাথে সাথে চিন্তাচেতনার পরিমিতিবোধ জেগে ওঠে।

A-Attractive (আকর্ষণীয়) : মানুষকে আকর্ষণ করার মতো মোহনীয় ক্ষমতা না থাকলে, নেতার অনুসারী তৈরি হয় না। অনুসারীরা নেতার মধ্যে এমন কিছু খুঁজে পেতে চায়, যা তাদেরকে আকৃষ্ট করবে। এই বিশেষ কিছুই তাদেরকে নেতৃত্বের প্রতি অনুগত রাখে।

D-Determination (দৃঢ় সংকল্প) : নেতা হবেন দৃঢ়চিত্তের। যাবতীয় বাধা-প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করবেন সহজেই। কোনো শক্তিই তাকে নিজের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, নীতি ও অবস্থান থেকে দূরে রাখতে পারবে না। হাজারও প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে চলবেন আপন পথে। দায়িত্ব পালন করবেন পথ প্রদর্শকের।

E-Energetic (পরিশ্রমী) : নেতা কখনো ক্লান্ত বা অলস হবেন না। অন্যথায় সবাই হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবে। জনগণের মনোবল একবার ভেঙে গেলে পুনরায় তা জোড়া দেওয়া খুবই কঠিন। এজন্য নেতাকে হতে হবে অধিক পরিশ্রম করার মানসিকতাসম্পন্ন।

R-Reliable (আস্থাশীল) : নেতাকে হতে হবে নির্ভরতার প্রতীক এবং বাস্তববাদী, যেন কর্মীরা তার প্রতি আস্থা রাখতে পারে নিঃসংকোচে। যদি কোনো কারণে একবার আস্থার সংকট হয়, তবে তা পুনরুদ্ধার করা অতিশয় কঠিন হয়ে পড়ে।

S-Self Confidence (আত্মবিশ্বাস) : নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকলে সবকিছুই অর্জন সম্ভব। বলা যায়, Have faith in yourself, all power is in you. নিজের চিন্তা, দর্শন ও আদর্শের প্রতি এমন আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে, যা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহসী হতে সাহায্য করবে। নেতার এই আত্মবিশ্বাস দেখে কর্মীরা নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাবে।

H-Helicopter View (ওপর হতে দেখা) : হেলিকপটার বা আকাশযানে আরোহণ করলে, ওপর থেকে এক নজরে সবকিছু দৃষ্টিগোচর হয়। অনুরূপ নেতাকেও দূরদর্শী, দক্ষ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ হতে হবে; যেন কিঞ্চিৎ চোখ বুলিয়েই পুরো ব্যাপারটা বুঝে ফেলতে পারেন।

I-Inspiring (প্রেরণাদায়ী) : নেতাকে অবশ্যই অনুপ্রেরণাদাতা হতে হবে। বিখ্যাত মনীষী, রোমের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বক্তা ও আইন প্রণেতা সিসেরো বলেন, ‘পবিত্র অনুপ্রেরণা ব্যতীত আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারেনি’। নেতা তার কর্মীদের উদ্দীপ্ত করবেন, সাহস দেবেন, ভরসা জোগাবেন। তাহলেই অনুসারীরা কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

P-Pursuit of Excellence (লক্ষ্য অর্জনে শ্রেষ্ঠত্ব) : নেতৃত্ব একটি শিল্প। তাই নেতাকে কাজকর্ম, কথা ও আচরণে অনন্য এবং অসাধারণ হতে হবে। লক্ষ্য অর্জনে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে। যে কাজেই করুক না কেন, তা নিখুঁত হতে হবে। কারণ, নেতার ভুলত্রুটি অনুসারীদের উৎসাহ নষ্ট করে।

কে নেতা

নেতা হলেন একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের কর্ণধার বা নাবিক। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল, ব্যবসা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সব ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নেতার অস্তিত্ব এবং ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সমাজে ও পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের নেতার অস্তিত্ব লক্ষণীয়। পারিভাষিকভাবে নেতা হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যিনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কোনো দল, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কোনো একক ব্যক্তিকে পরিচালনা করেন। তিনি তার অনুসারীদের দিকনির্দেশনা দেন এবং তাদেরকে সরাসরি পরিচালনা করেন।

অনুসারী এবং তার নিজের কাজের পরিকল্পনা তৈরি করেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের তদারকি করেন। কোনো ভুল হলে তা শুধরে দেন। মোট কথা, লক্ষ্য অর্জনে যা যা করা দরকার, নেতা ঠিক সেই কাজই করেন। বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান পণ্ডিত, Self-Control and Management by objectives থিওরির প্রবক্তা, Petar F. Drucker (১৯০৯-২০০৫) বলেন,

‘একজন দক্ষ নেতা হচ্ছেন তিনি, যিনি সাধারণ মানের লোকদের দিয়ে অসাধারণ কাজ করান এবং অসাধ্য সাধনে সক্ষম করে তোলেন। নেতা যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো যোগ্য হবেন এবং প্রয়োজন হলে অনুসারীদের স্বার্থে যেকোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।’

নেতা শব্দটি শুনলে আমরা সাধারণত রাজনীতিবিদরাই বুঝে থাকি। তবে নেতা শুধু রাজনীতিবিদরাই নন, দায়িত্ব ও সামর্থ্যের দিক থেকে আমরা প্রত্যেকেই এক একজন নেতা। নেতা শব্দটি অনেকটা কাঁচামালের মতো। ক্ষেত্রের ভিন্নতায় এর নামও ভিন্ন হয়ে থাকে; যেমন-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক, প্রশাসনের ক্ষেত্রে নির্বাহী, রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ ইত্যাদি। একইভাবে সরকারপ্রধান, জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা, থানার পরিদর্শক, গবেষণা দলের প্রধান, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবস্থাপক, হাসপাতালের পরিচালক, পরিবারের প্রধান, ক্লাসের ক্যাপ্টেন, এমনকী বাসের ড্রাইভার বা রেস্টুরেন্টের বাবুচিও তাদের স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে নেতা। এনারা সবাই নিজ নিজ কাজ বাস্তবায়নে আশপাশের লোকদের পরিচালনা করে থাকেন। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা সবাই কোনো না-কোনো ক্ষেত্রে অন্যকে পরিচালনা করে থাকি; এমনকী তা একজন হলেও। তাই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে আমরা সকলেই নেতা। আর নেতা হিসেবে সকলেরই কিছু সুস্পষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্য ও নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সেইসঙ্গে নির্ধারণ করে দিয়েছেন কিছু সুস্পষ্ট কর্তব্যও। এই কর্তব্য সম্পর্কে সকলকেই জবাবদিহি করতে হবে। যেমন আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি মুহাম্মাদ (সা.) বলেন—

‘তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম তথা জনতার নেতা একজন দায়িত্বশীল; তিনি তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ দায়িত্বশীল তার পরিবারের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। স্ত্রী দায়িত্বশীল তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে। মানুষের (দাস) ভৃত্য দায়িত্বশীল মুনিবের সম্পদের, সে জিজ্ঞাসিত হবে তার মুনিবের সম্পদ সম্পর্কে। অতএব, সতর্ক থেক, তোমরা সবাই দায়িত্বশীল আর সবাই জিজ্ঞাসিত হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে।’ বুখারি : ৭১৩৮; মুসলিম : ৪৮২৮; আবু দাউদ : ২৯৩০

সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টি প্রতিটি মানুষই আল্লাহর নির্ধারিত এই দায়িত্ব পূরণে নেতার ভূমিকা পালন করেন।

নেতা ও নেতৃত্বের পার্থক্য

সাধারণত নেতা ও নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা প্রায় দুরূহ ব্যাপার। নেতা ও নেতৃত্ব পারস্পরিক দুটো প্রসঙ্গ, একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নেতার প্রতিচ্ছবিতে নেতৃত্ব এবং নেতৃত্বের প্রতিফলনে নেতার পরিচয় পাওয়া যায়। নেতৃত্ব হলো লক্ষ্য অর্জনে কৌশল বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া, আর নেতা হলো দিকনির্দেশক। তারপরও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে এসব পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	নেতা	নেতৃত্ব
সংজ্ঞা	যে ব্যক্তি কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনুসারী বা অধস্তনদের আদেশ-নিষেধ প্রদান করেন, দিকনির্দেশনা দেন এবং পরিচালনা করেন তাকে নেতা বলে।	নেতৃত্ব হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কাজক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে জনগণের সহযোগিতা লাভ করা যায়।
প্রকৃতি	নেতা হচ্ছেন একজন ব্যক্তি, যিনি অধস্তন কর্মীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন।	নেতৃত্ব এমন একটি প্রক্রিয়া বা কৌশল যার মাধ্যমে অধস্তনদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
কার্যাবলি	নেতার মৌলিক কাজ হচ্ছে অধস্তনদের প্রভাবিত করা, পরিচালিত করা, নির্দেশনা প্রদান, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ।	নেতৃত্বের কাজ হলো নেতার নির্দেশনা ও কর্মপ্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপান্তর ও প্রয়োগ করা।
বিকাশ	নেতাকে কেন্দ্র করে নেতৃত্বের সূচনা ও বিকাশ লাভ করে।	নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে নেতার সূচনা হয় না।
নির্ভরতা	নেতার আচরণ দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাভাবনা, মূল্যবোধ, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির ওপর নেতৃত্বের রূপরেখা নির্ভর করে।	নেতৃত্বের সাফল্য ও কার্যকারিতার ওপর নেতার সাফল্য ও ফলাফল নির্ভর করে।
তাৎপর্য	নেতার তাৎপর্য নির্ভর করে অধস্তনদের প্রভাবিতকরণের প্রচেষ্টার ওপর।	নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতার পরিবর্তে তার কার্যাবলি ও প্রভাবিতকরণের প্রক্রিয়া গুরুত্ব লাভ করে থাকে।
পরিস্থিতি	পরিস্থিতির আলোকে বিভিন্ন ধরনের নেতার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।	পরিস্থিতির আলোকে নেতৃত্বের যোগ্যতা বা গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়।

নেতৃত্বের ফলপ্রসূতার উপাদান

Prophet of Management গ্রন্থের লেখক, মার্কিন দার্শনিক Mary Parker Follett (১৮৬৮-১৯৩৩)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি ‘The most successful leader of all is one who sees another picture not yet actualized.’ নেতৃত্বের ফলপ্রসূতার উপাদান বলতে সেই সকল উপাদানকে বোঝায়, যার দ্বারা একজন নেতা তার অনুসারীদেরকে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম। উপাদান ছাড়া কোনো বস্তুর আদর্শ ফলাফল তৈরি করা সম্ভব নয়। নেতৃত্বের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী নেতৃত্বের ফলপ্রসূতার উপাদানগুলো হলো :

- **নেতার দক্ষতা :** নেতৃত্বের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে, তিনি লক্ষ্য অর্জনে কতটুকু সক্ষম হবেন। নেতার লক্ষ্য স্থির করার দক্ষতা, অধস্তন এবং উর্ধ্বতনদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের দক্ষতা, লক্ষ্য অর্জনে অনুসারীদের প্রভাবিত ও উৎসাহিত করার দক্ষতার ওপর নির্ভর করে সফলতা অর্জনের সক্ষমতা।
- **লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা :** একজন দক্ষ নেতা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করেন এবং অধীনস্থদের তা সম্যকভাবে অবহিত করেন। সেইসাথে লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুসারীদের সুস্পষ্ট ধারণা দিয়ে থাকেন। কর্মীরা উদ্দেশ্যের কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতন থাকলে, লক্ষ্য বাস্তবায়নে তারা তৎপর হয়ে ওঠে। এ ছাড়া লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধস্তনদের পরামর্শ গ্রহণ করা নেতার জন্য জরুরি।
- **প্রভাবিত করার ক্ষমতা :** অধীনস্থদের কর্মের কার্যকারিতা অনেকাংশে নেতার প্রভাবিত করার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। সঠিকভাবে অনুসারীদের প্রভাবিত ও উৎসাহিত করতে না পারলে তারা প্রত্যাশিত মানের শ্রম ও মেধা প্রদান থেকে বিরত থাকে। এতে কাজক্ষিত সফলতা অর্জনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় এবং দল ও সংগঠন নেতৃত্ব সংকটে পড়ে।
- **শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতা :** কর্মী এবং অধীনস্থদের মাঝে শৃঙ্খলা বিধান নেতৃত্বের অন্যতম উপাদান। যে দল কিংবা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে, সেখানে নেতৃত্ব ব্যবস্থা সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে না। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দল, প্রতিষ্ঠান কিংবা সংগঠনের সকল কর্মীকে শৃঙ্খলার ফ্রেমে আবদ্ধ করা জরুরি।
- **আনুগত্য করার মানসিকতা :** অধীনস্থরা যেমন নেতার প্রতি আনুগত্যশীল হবে, তেমনি নেতাও তার উর্ধ্বতনদের প্রতি অনুগত হবেন। নেতা যে প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের অধীনে কাজ করবেন, তার যাবতীয় নিয়ম-নীতি সঠিকভাবে মেনে চলবেন।
- **পরিবেশ বিশ্লেষণের ক্ষমতা :** পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে নেতৃত্ব তৈরি হয়। তাই ভালো নেতৃত্বের অধিকারী হতে হলে পরিবেশ পরিস্থিতির যথাযথ বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকা জরুরি। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সঠিক সময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপর নেতৃত্বের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

- **যোগাযোগের দক্ষতা** : দল, সংগঠন এবং সকল অধস্তনের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করার দক্ষতা, নেতৃত্বের অন্যতম উপাদান। যোগাযোগ ত্রুটিপূর্ণ হলে লক্ষ্য অর্জন ব্যহত হয়। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে সঠিকভাবে যোগাযোগ স্থাপনের দক্ষতা শুধু লক্ষ্য অর্জনেই সহায়ক নয়; বরং লক্ষ্য পূরণের সময়কে অনেকাংশেই কমিয়ে আনে।
- **মানসিকতা অনুধাবন ও নিয়ন্ত্রণ** : যোগ্য নেতৃত্ব অধীনস্থদের ওপর শতভাগ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। আর কর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সবার আগে তাদের মানসিকতা বুঝতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অধীনস্থদের মানসিকতা এবং চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, তা কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়।
- **ভিশনারি হওয়া** : একজন নেতাকে অবশ্যই ভিশনারি হতে হবে। দল বা সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নেতাকে শতভাগ অবগত থাকতে হবে এবং তা অর্জনে চালাতে হবে কার্যকর প্রয়াস। এই ভিশন শুধু নিজের ভেতর ধারণ করাই যথেষ্ট নয়; বরং ছড়িয়ে দিতে হবে অনুসারীদের মাঝেও।
- **সময় সচেতনতা** : বলা হয়ে থাকে সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। সময়ের কাজ সময়ে না করলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সময় সচেতনতা নেতৃত্বের অন্যতম উপাদান।
- **পারস্পরিক সম্পর্ক** : সংগঠনের অধস্তন জনশক্তির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক নেতৃত্বের মান ও বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে। নেতার সাথে অধস্তনদের সম্পর্ক যদি ভালো হয়, তবে নেতৃত্ব অধিক ফলপ্রসূ হয়। অনুসারীদের সাথে নেতার সম্পর্ক যত সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে, নেতৃত্বদানে তিনি ততই সক্ষম হবেন।
- **আত্মবিশ্বাসী হওয়া** : সঠিকভাবে নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য মনে আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। যেকোনো কাজের সফলতায় নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস রাখা অপরিহার্য।
- **সংকট মোকাবিলা** : নেতাকে সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে অনুসারীদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। সফল ও ফলপ্রসূ নেতাকে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নেতাই হবে যেকোনো সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানকারী।
- **সমালোচনা গ্রহণের মানসিকতা** : সমালোচনার মুখোমুখি হওয়া যেকোনো পর্যায়ের নেতার জন্যই স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্য সমালোচনাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা থাকা একজন নেতার জন্য আবশ্যিক। মূলত সমালোচনার মাধ্যমে নেতা তার কাজের ফিডব্যাক পেয়ে থাকেন; কাজের ত্রুটি বুঝতে পারেন। তাই সমালোচনার দরজা সবসময়ই খোলা রাখা উচিত।

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

নেতৃত্ব ছাড়া কোনো দল বা সংগঠন চলতে পারে না। নেতাকে ঘিরেই অধস্তন জনশক্তি আবর্তিত হয়। তাই কাঙ্ক্ষিত মানের নেতৃত্ব না থাকলে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে নেতৃত্ব কখনোই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। সঠিক নেতৃত্বের ওপর সাফল্য নির্ভর করে।

- **লক্ষ্য অর্জন :** লক্ষ্য অর্জনে দক্ষ নেতৃত্ব অপরিহার্য। কর্মীবাহিনী এবং অধীনস্থরা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে একত্রিত হয়। নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন নেতা থাকলে, জনশক্তির ধ্যানধারণা ও কর্মপ্রচেষ্টা নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে পরিচালিত হতে পারে।
- **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার :** নেতার হাতে মানব সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, আর্থিক সম্পদ, স্থায়ী সম্পদ, অবকাঠামোগত সম্পদ, তথ্য-প্রযুক্তি, দক্ষ ব্যবস্থাপক, সমর্থন, সুনাম ইত্যাদি নানা ধরনের সম্পদ থাকে। লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধাপে এ সকল সম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। একজন দক্ষ নেতাই পারেন, এ সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে।
- **সমন্বয় সাধন :** সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নেতার অধীনে কর্মীরা একত্রিত হয়। এই কর্মীদের সাথে যোগাযোগ, কাজে সমন্বয় সাধন, প্রতিটি বিভাগ ও ব্যক্তির কাজকে এক সুতায় গ্রোথিতকরণ, প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদের বণ্টন ইত্যাদি কাজের জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। নেতা প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দিয়ে তা আদায় করেন এবং লক্ষ্য অর্জনে সকল কাজের মাঝে সমন্বয় সাধন করেন।
- **কর্মীদের প্রেষণা প্রদান :** কর্মীদের প্রেষণা দানে নেতৃত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দল কিংবা সংগঠনের কর্মীদের থেকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য, নেতৃত্বকে সর্বদা প্রেষণা প্রদান করতে হয়। প্রেষণা প্রদানে সাধারণত দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় :
 - ক. **ইতিবাচক প্রেষণা :** এই পদ্ধতিতে কর্মীদের প্রশংসিত কাজের জন্য তারিফ ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়; কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়। ইতিবাচক প্রেষণাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়; (১) আর্থিক প্রেষণা ও (২) অনার্থিক প্রেষণা।
 - খ. **নেতিবাচক প্রেষণা :** অনেক কর্মীদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রেষণা খুব একটা কাজ করে না। তাদের থেকে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য ভয়ভীতি প্রদর্শন, শাস্তি প্রদান করা বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। প্রেষণা প্রদানের এই ধরনের কৌশলকে নেতিবাচক প্রেষণা বলে।
- **কার্যকারিতা বৃদ্ধি :** দল, প্রতিষ্ঠান অথবা সংগঠনের কর্মীদের কাজের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতেও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য। অনুসারীদের যথাযথ নির্দেশনা, পরিচালনা ও নেতৃত্বদানের মাধ্যমে নেতা জনশক্তিকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে নিয়ে যান। এজন্য কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

- **সম্পর্ক উন্নয়ন :** দলীয় কাজ অথবা দলগত প্রচেষ্টার সাফল্য সর্বদা সেই দলের সদস্যদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ওপর নির্ভর করে। পারস্পরিক বোঝাপড়ায় ঘাটতি থাকলে টিম ওয়ার্ক মুষড়ে পড়তে বাধ্য। পরিবারসুলভ, বন্ধুত্বপূর্ণ ও হৃদয়তাপূর্ণ কাজের পরিবেশ হলে কর্মীরা লক্ষ্য অর্জনে শতভাগ শ্রম ও মেধা ব্যয় করতে অণুপ্রাণিত হয়।
- **দলগত প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করা :** নেতৃত্বের মূল কাজই হচ্ছে দলীয় প্রচেষ্টাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিমুখী করা। নেতৃত্ব যত দক্ষ হবে দলগত প্রচেষ্টা তত সুনিপুণ হবে। তাই দলের সকলের প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করে লক্ষ্য অর্জনে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নেতৃত্বের মান দুর্বল হলে জনশক্তির মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং দলবদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়।
- **সামাজিক সম্পৃক্ততা ও দায়িত্ব :** সামাজিক জীব হিসেবে সমাজের প্রতি সকলেরই দায়বদ্ধতা রয়েছে। নেতাও এর ব্যতিক্রম নন। বিভিন্ন সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকেও নানান সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ সকল দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজন দক্ষ নেতৃত্বের।
- **নমনীয়তা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি :** আধুনিক বিশ্ব অত্যন্ত গতিশীল। প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের চারপাশ। তাই প্রথাগত কোনো সিদ্ধান্ত বা মূলনীতির ওপর বেশিদিন অটল থাকা সম্ভব নয়। নেতৃত্ব যত বেশি নমনীয় হবে সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা তত বৃদ্ধি পাবে।

নেতৃত্বের তত্ত্ব ও কার্যাবলি

নেতৃত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

নেতৃত্ব এমন একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যা সামষ্টিক চিন্তাচেতনাকে একীভূত করে লক্ষ্য অর্জনে উজ্জীবিত করে। প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের ধরন, নিয়োজিত কর্মীবাহিনী এবং অন্যান্য উপায়-উপকরণের যথাযথ সমন্বয় সাধন করার মাধ্যমে নেতৃত্বকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। তাই নেতৃত্বের ধরন নিয়ে ব্যাপক চিন্তাভাবনার দাবি রাখে। নেতৃত্ব সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও বিশারদগণ বিভিন্ন তত্ত্ব বা মতবাদ প্রদান করেছেন।

● গুণ বা বৈশিষ্ট্যভিত্তিক তত্ত্ব (The Trait Theory of Leadership)

এটি নেতৃত্বের সবচেয়ে প্রাচীন তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। এ তত্ত্বের মূল ধারণা হলো ‘নেতা গড়ে উঠে না, নেতা জন্মলাভ করে’। মহামানব তত্ত্ব (Gentleman theory) নামেও এ তত্ত্বকে অভিহিত করা যায়। ১৯৬০ সালে Milestone University-এর কতিপয় গবেষক, ৪৮৬ জন্য ব্যক্তির ওপর একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সেই গবেষণায় প্রমাণিত হয়, কতগুলো গুণই প্রশাসককে যোগ্য নেতৃত্ব প্রদানে সহায়তা করে। এ তত্ত্বের মূলকথা হলো, যার মধ্যে কতিপয় বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, প্রকৃত অর্থে সেই নেতা হওয়ার যোগ্য। এ সকল গুণের মধ্যে সততা, ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা, বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা ও উদ্যম, উচ্চাশা, বন্ধুপরায়ণতা, স্নেহশীলতা উল্লেখযোগ্য।

● পরিস্থিতিভিত্তিক নেতৃত্ব তত্ত্ব (Situation Theory of Leadership)

অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী, আলোচিত Fiedler Contingency Model-এর প্রবক্তা, Fred. E. Fiedler (১৯২২-২০১৭) এবং তার অনুসারীরা এ তত্ত্বটি উদ্ভাবন করেন। এ তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে ‘Leaders are the products of given situation’ অর্থাৎ ‘বিশেষ পরিস্থিতিতেই নেতার আবির্ভাব ঘটে।’ নেতৃত্ব সৃষ্টিতে পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে ব্যক্তিগত গুণাবলির যোগসূত্র রয়েছে বলে, এ তত্ত্ব মনে করে থাকে। যিনি পরিবেশ পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যক্তিগত গুণাবলির সফল ব্যবহার করতে পারেন, তিনিই নেতা হিসেবে পরিগণিত হবেন। এ তত্ত্বের মূল দর্শন হলো, বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিই নেতৃত্বকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে।

● নেতৃত্বের উদ্দেশ্যমুখী তত্ত্ব (Path-goal theory Leadership)

Robert House এবং তার অনুসারীরা কর্মীদের লক্ষ্য অভিমুখী কাজকর্মের ওপর গুরুত্বারোপ করে এ তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। এ তত্ত্বের মূল দর্শন হলো, নেতা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ঠিক করবেন। অধস্তনদের নিকট উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে, লক্ষ্য অর্জনের জন্য পথ নির্ধারণ করবেন। পথের বাধা পরাভূত করে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করবেন, যাতে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়।

নেতৃত্বের উদ্দেশ্যমুখী তত্ত্ব পরিস্থিতিভিত্তিক নেতৃত্ব তত্ত্বের সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। J. H. Robert (1974) এরূপ তত্ত্বের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, ‘নেতার কাজ হলো কাঠামোগত সহায়তা দান ও পারিশ্রমিক প্রদানের মাধ্যমে কার্য পরিবেশ সৃষ্টি করা, যা কর্মীদের সাংগঠনিক উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে।’

Robert House নেতৃত্বের চারটি স্টাইল উল্লেখ করেন।

ক. নির্দেশনামূল নেতৃত্ব (Directive Leadership) : এ ধরনের নেতৃত্ব অধস্তনদের কাজ থেকে কী প্রত্যাশা করে, তা নির্দেশনার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়।

খ. সহায়ক নেতৃত্ব (Supporting Leadership) : এ ধরনের নেতৃত্ব কর্মীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে এবং কল্যাণ কামনা করে।

গ. অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব (Participative Leadership) : অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন।

ঘ. সাফল্যমুখী নেতৃত্ব (Achievement directive leadership) : লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রেষণা প্রদান করে এবং অধস্তনদের পরিচালিত করে।

• নেতৃত্বের আচরণভিত্তিক তত্ত্ব (Behavioral Theory of Leadership)

এ তত্ত্বের মূল বিষয় হলো, নেতার কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ বা আচরণের ওপর নির্ভর করে নেতৃত্ব। নেতার আচরণ, আশা-আকাঙ্ক্ষা অধস্তনদের সাথে সংগতিপূর্ণ হলেই একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনকে নেতৃত্ব প্রদান করা সম্ভব। এ তত্ত্ব নেতার আচরণশৈলী ও সম্পর্কের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। নেতাকে একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমে অধস্তনদের সাথে আচরণ, নির্দেশ দান এবং পরিকল্পনা করতে হবে। মানুষের ব্যক্তিগত আচরণের এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা তার সহযোগী বা অধস্তনদের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করে। গবেষকগণ মনে করেন, নেতার আচরণের ওপর ভিত্তি করে সঠিক নেতৃত্বের ধরন নির্বাচন প্রয়োজন। উত্তম আচরণ সম্পর্কে জনৈক ফ্রায়া স্টার্ক বলেন, ‘উত্তম আচার-আচরণ অঙ্কশাস্ত্রের শূন্যের মতো! আপাতদৃষ্টিতে এর গুরুত্ব ততটা বোঝা যায় না, কিন্তু সবকিছুর সাথে এর সংমিশ্রণ বিরাট মূল্য পরিবর্তন করে।’

• অনুগামী তত্ত্ব (The follower's approach of leadership)

এ তত্ত্ব এফ.এইচ.লুইচ প্রবর্তন করেন। এ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো, নেতা অধস্তনদের অভাব অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট, চাহিদা পূরণে আন্তরিক হলে, সে একজন যোগ্য নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়। কারণ, অভাবগুলো পূরণ হলে কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে এবং নেতার প্রতি অনুগত হয়।

• রূপান্তরযোগ্য নেতৃত্ব (Transformational Leadership)

নেতা নিজের বিশেষ ক্ষমতা এবং মিশন ও ভিশনকে অধস্তনদের সাথে শেয়ার করে চিন্তাধারার পরিবর্তন করেন। এ ধরনের নেতৃত্ব একটি শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে কর্মীদের নিজেদের উৎসর্গ করার মানসিকতা সৃষ্টি, আত্মবিশ্বাসী করা এবং সৃজনশীল কৌশল আবিষ্কারে সহযোগিতা করে।

Wehrich and Koontz (1994)-এর ভাষায়, ‘পরিবর্তনীয় নেতৃত্ব সংগঠনের ভিশনকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করে এবং অনুসারীদের অণুপ্রাণিত করে। এ জাতীয় নেতার প্রেরিত করার, সংগঠনের সংস্কৃতিকে পরিবর্তন করার এবং সাংগঠনিক পরিবর্তনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে।’

• আদান-প্রদান নেতৃত্ব (Transactional Leadership)

এ ধরনের নেতৃত্বের মূল কথা হলো, ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং ব্যর্থ কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়। নেতা কাজ করার জন্য অনুসারীদেরকে অণুপ্রাণিত করেন। নেতা এবং কর্মীর মধ্যে বোঝাপড়া ভালো হলে লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

• ম্যাকগ্রেগরের ‘X’ তত্ত্ব এবং ‘Y’ তত্ত্ব

MIT Sloan School Of Management-এর সাবেক প্রফেসর ও মার্কিন চিন্তাবিদ Douglas MacGregor (1960) তাঁর ‘The Human Side of Enterprise’ নামক গ্রন্থে সব মানুষকে দুভাগে ভাগ করেছেন। মানুষকে তার আচরণ ও কাজের প্রতি মনোযোগের ওপর ভিত্তি করে এই দুটো ভাগকে তিনি X’ তত্ত্ব এবং ‘Y’ তত্ত্ব নামে অভিহিত করেছেন।

‘X’ তত্ত্ব : ‘X’ তত্ত্বে কর্মীদের আচরণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণাসমূহ (Assumptions) পোষণ করা হয়ে থাকে-

- কর্মীরা স্বভাবগতভাবেই অলস প্রকৃতির, কাজ পছন্দ করে না।
- অধিকাংশ কর্মী ফাঁকিবাজ এবং সুযোগ পেলেই দায়িত্ব এড়াতে চায়।
- কর্মীদেরকে দিয়ে কাজ আদায় করতে হলে ভয়, ভীতি, চাপ প্রয়োগ ও শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- কর্মীদের জন্য কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যিক হবে।
- গড়পড়তা কর্মীরা নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার খুব একটা প্রয়োগ করে না। এ কারণে তারা নির্দেশিত ও পরিচালিত হতে পছন্দ করে।
- অধিকাংশ কর্মীই গতানুগতিক প্রকৃতির, পরিবর্তন পছন্দ করে না।
- কর্মীরা কার্যক্ষেত্রে অন্যকিছুর চেয়ে নিরাপত্তার দিকটি অধিক গুরুত্ব দেয়।
- বেশিরভাগ মানুষ দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চায় এবং উদ্বর্তনের নির্দেশনা ছাড়া নিজে থেকে কিছুই করতে চায় না।
- অধিকাংশ লোক হতাশ, নেই কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

‘Y’ তত্ত্ব (Theory ‘Y’) : Y-তত্ত্ব X-তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করে। এ তত্ত্বে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে। Y-তত্ত্বের মূল কথা হলো কর্মীরা কাজের যথাযথ পরিবেশ পেলে যেকোনো কাজ সফলতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম।

- কর্মীরা কাজ অপছন্দ করে না; কাজকে খেলাধুলা ও বিশ্রামের মতোই স্বাভাবিক মনে করে।
 - কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও নিজেদের তাগিদেই কাজ সম্পাদন করবে, কাজ আদায় করার জন্য ভয়-ভীতি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।
 - কর্মীরা দায়িত্ববান, দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিজেদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেতে চায়।
 - কর্মীরা স্বনির্দেশিত (Self-directed) থাকতে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণকে (Self-control) পছন্দ করে।
 - কর্মীরা কার্য সম্পাদনের পদ্ধতি ও পরিবেশগত পরিবর্তনকে মেনে নেয়।
 - কর্মীরা শুধু কার্যক্ষেত্রে নিজেদের নিরাপত্তাই চায় না, প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি এবং সুনামও আশা করে।
 - কর্মীরা ব্যবস্থাপকদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে আগ্রহী; সুযোগ পেলে নতুনত্ব উদ্ভাবন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূল্যবান অবদান রাখতে সক্ষম।
 - সাধারণত মানুষ দায়িত্বশীল হয়ে থাকে। কখনো কখনো তারা অতিরিক্ত দায়িত্বও খুঁজে নেয়।
- ম্যাগগ্রেগরের উদ্ভাবিত তত্ত্ব দুটো থেকে মানুষের প্রকৃতি ও আচরণ সম্পর্কে বিপরীতধর্মী ধারণা লাভ করা যায়। X-তত্ত্বে বিশ্বাসী ব্যবস্থাপক কর্মীদেরকে অণুপ্রাণিত করার ক্ষেত্রে স্বৈরতান্ত্রিক নীতির অনুসরণ করেন এবং Y-তত্ত্বে বিশ্বাসী ব্যবস্থাপক গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করেন।

নেতৃত্বের প্রক্রিয়া

প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনে নেতা তার অনুসারীদের যেভাবে পরিচালিত করেন, তার ধাপই হচ্ছে নেতৃত্বের প্রক্রিয়া। কোনো কাজ বা পরিকল্পনা সম্পাদনের রূপরেখা প্রদান করা হয়, নেতৃত্বের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নেতৃত্বের প্রক্রিয়ার পাঁচটি ধাপ রয়েছে।

- **ধাপ ১. নেতৃত্বকে জানা :** প্রথমত, নেতাকে নেতৃত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। নেতার লক্ষ্য কী, কী করবে, কেন করবে, কীভাবে করবে ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হবে। নেতা কী করছেন, কেন করছেন, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনুসারীদের দিয়ে সর্বোচ্চ কাজ করিয়ে নিতে পারবেন না।
- **ধাপ ২. প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা পরিবেশ সম্পর্কে মূল্যায়ন :** নেতৃত্ব প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে নেতা যে প্রতিষ্ঠান, দল, পরিবেশে কাজ করবেন, সে সম্পর্কে বিশদ জানা। পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝতে পারলে নেতার পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া অনেক সহজ হয়ে যায়। পরিবেশ কিংবা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা না থাকলে নেতার মধ্যে সংকোচবোধ কাজ করে। এতে নেতৃত্বের কার্যকারিতা কমে যায়।
- **ধাপ ৩. কৌশল নির্ধারণ :** এই পর্যায়ে নেতৃত্বকে কৌশল নির্ধারণ করতে হয়। নেতৃত্ব প্রক্রিয়ার এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই ধাপে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেতৃত্ব বাস্তবায়িত হবে। সংক্ষেপে বললে, প্রাতিষ্ঠানিক বা সাংগঠনিক লক্ষ্য অর্জনের যতগুলো বিকল্প রয়েছে, সেখান থেকে সবচেয়ে উত্তম পন্থাকে নির্বাচন করাই কৌশল নির্ধারণ ধাপের কাজ।

- **ধাপ ৪. পরিবর্তন প্রক্রিয়া নির্ধারণ :** নেতৃত্বের প্রক্রিয়ার চতুর্থ ধাপ হচ্ছে প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনে কোনো পরিবর্তন প্রয়োজন হলে, সেই পরিবর্তনের স্বরূপ নির্ধারণ করা। এই ধাপে উর্ধ্বতন নেতৃত্বের ক্রটি, প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা, কার্য সম্পাদনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধানের পন্থা নির্ধারণ করা হয়।
- **ধাপ ৫. সমন্বিত পর্যবেক্ষণ :** নেতৃত্বের প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে সমন্বিত পর্যবেক্ষণ। এই ধাপে নেতা তার অধীনে থাকা সব কর্মীদের কাজের তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি কাজকে পরিকল্পনার সাথে মিলিয়ে মূল্যায়ন করেন। কাজে যদি কোনো ক্রটি থাকে, তবে তা দূর করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

কুঞ্জ এবং পজনার তাদের প্রকাশিত *The road to great leadership* নামক গ্রন্থে মহৎ নেতৃত্বের প্রক্রিয়া হিসেবে পাঁচটি ধাপের কথা উল্লেখ করেছেন, যা সফল নেতৃত্বের জন্য অনুসরণীয়। ধাপগুলো হচ্ছে—

১. নতুন পন্থা গ্রহণের সাহস : নেতা তার সার্বিক উন্নয়নের জন্য আত্মবিশ্বাসের সাথে নতুন পদ্ধতির অনুসন্ধান করবেন।
২. চিন্তার প্রসার : নেতা নিজের চিন্তা ও ভিশনকে অনুসারীদের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন।
৩. অন্যকে সক্রিয় করা : উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে অন্যদেরকে কাজে সক্রিয় রাখবেন।
৪. কাজ সমাধানের মডেল সৃষ্টি : সাধারণত একজন বস কাজের আদেশ দেন, অন্যদিকে নেতা নিজেই কাজ করে মডেল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেন।
৫. কাজের জন্য আন্তরিকতা সৃষ্টি : নিজের মনের মধ্যে শত কষ্ট থাকা সত্ত্বেও অনুসারীদের সাথে এমনভাবে আচরণ করবেন, যেন তাদের মাঝে কাজ করার আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়।

নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য

- **অধস্তনদের সম্পর্কে ধারণা :** অধস্তনদের সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা একজন নেতাকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠান চালাতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। অধস্তনরা তাদের নেতাকে পথ প্রদর্শক ও শুভাকাজক্ষী হিসেবে পেতে চায়। তাই অধস্তনদের মান, দক্ষতা, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে নেতার জানা থাকলেই অনুসারীদেরকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।
- **পরিবেশের সাথে সংগতি বিধান :** যোগ্য নেতৃত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সবসময়ই পরিবেশের সাথে সংগতি বিধান করে চলা। বিশেষ পরিবেশের জন্যই বিশেষ ব্যক্তি নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেন। একেক পরিবেশে একেক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি নেতা হিসেবে বিবেচিত হন। যে নেতা যত বেশি পরিবেশ বুঝে অধস্তনদের আদেশ-নির্দেশ প্রদান ও তত্ত্বাবধান করবেন, তার পক্ষে তত বেশি সফলতা লাভ সম্ভব।

- **অধস্তনদের আনুগত্য :** নেতৃত্ব আনুগত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অধস্তনদের আনুগত্য না থাকলে নেতৃত্ব কখনই সফলকাম হতে পারে না। এরূপ আনুগত্য স্বেচ্ছামূলক হোক বা বাধ্যতামূলক হোক। নেতৃত্বের পক্ষে অধস্তনদের আনুগত্য লাভ প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্যার্জনে অপরিহার্য শর্ত।
- **অনুসারীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ :** যোগ্য নেতৃত্বের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তা সবসময়ই অধস্তনদের সাথে কার্যকর সম্পর্ক ও যোগাযোগ রক্ষা করে পরিচালিত হয়। নেতার সাথে অধস্তন কর্মীদের যদি যোগাযোগ বা সম্পর্ক না থাকে সেক্ষেত্রে কার্যকর নেতৃত্বের প্রশ্নই আসে না।
- **ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপস্থিতি :** নেতার মাঝে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকা আবশ্যিক, যা প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য। আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কারণে অধস্তনরা নেতার অনুসরণ করে। নেতা আনুষ্ঠানিকভাবে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হলে অধস্তনরা বাধ্যতামূলকভাবে আনুগত্য করে।
- **ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা :** নেতাকে বিভিন্ন সময় ঝুঁকি নিতে হয়। নেতা যেহেতু কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন, তাই তাকে কাজের দায়িত্ব ও ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়।
- **সার্বিক ধারণা :** নেতাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখতে হয়। এতে সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ হয়।
- **সমস্যা সমাধান :** যেকোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে বিচলিত না হয়ে ধৈর্য এবং দক্ষতার সাথে সমস্যার সমাধান করাই আদর্শ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

একজন সফলকাম নেতার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যিক

- **সাহস ও দৃঢ় মনোবল (Courage and determination) :** একজন নেতা অসীম সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে কর্মীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে পরিচালনা করেন। এই লক্ষ্য নির্ধারণ করা যেমন তার দায়িত্ব, তেমনি লক্ষ্যে পৌঁছানোর পন্থা নির্ধারণ করাও তার দায়িত্ব।
- **অনুসারীদের সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge about Subordinates) :** একজন সফল নেতার অবশ্যই তার অনুসারীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, শক্তি-সামর্থ্য, আনুগত্যের মাত্রা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত। নেতা যদি অনুসারীদের মন-মানসিকতা, ধ্যানধারণা বিবেচনায় এনে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে ওই নেতৃত্ব কখনই কার্যকর হতে পারে না।
- **দায়-দায়িত্ব গ্রহণে মানসিকতা (Mentality of Taking Responsibility) :** একজন নেতার কর্মীদের দায়-দায়িত্ব গ্রহণের মানসিকতা থাকা অপরিহার্য। নেতার মধ্যে যদি কর্মীদের কাজের দায়-দায়িত্ব গ্রহণের মানসিকতা না থাকে, তবে তার পক্ষে কখনই অনুসারীদের আস্থা অর্জন সম্ভব হয় না।

- **ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা (Ability to Control Emotion) :** একজন নেতার মাঝে আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। একজন সফল নেতাকে অবশ্যই সবসময় ভাবাবেগের উর্ধ্বে উঠে যুক্তি ও বাস্তবতা বিবেচনায় চিন্তা-ভাবনা সহযোগে কাজ করতে হয়।
- **ব্যক্তিত্ব (Personality) :** আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সবসময় মানুষকে প্রভাবিত করে। একজন নেতাকে অবশ্যই মোহনীয় ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয়। ব্যক্তিত্ব বলতে অন্যের মনে শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করে তাদের ইচ্ছাশক্তির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনকে বোঝায়। ব্যক্তিত্ব হলো মার্জিত ব্যবহার, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, গাভীর্যপূর্ণ আচরণ ও মমতা এবং আন্তরিকতা ও কর্তৃত্বের সংমিশ্রণে এক বিশেষ গুণ।
- **সাংগঠনিক জ্ঞান ও দক্ষতা (Organizational Knowledge and Skill) :** একজন নেতার সাংগঠনিক জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা আবশ্যিক। এজন্য কাজকে বাস্তবতার নিরিখে যথাযথভাবে বিভাজকরণ, কাজ অনুযায়ী উপযুক্ত কর্মী বাছাই, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের যথাযথ নিরূপণ ও বন্টন, সুষ্ঠু যোগাযোগব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, কার্যকর সমন্বয় সাধন এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নেতাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়।
- **শিক্ষাদানের ক্ষমতা (Teaching Capacity) :** লক্ষ্যপানে পরিচালনা করতে নেতার অনেক সময় অধস্তনদের শিক্ষাদান করতে হয়। সে কারণে, অনুসারীদের মাঝে যেন প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সৃষ্টি হয় সেজন্য নেতাকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হয়। ফলে নেতাকে একজন ভালো শিক্ষক হওয়ারও প্রয়োজন পড়ে। তাই বলা হয়, 'A good leader is a good teacher' অর্থাৎ একজন ভালো নেতা নিঃসন্দেহে একজন ভালো শিক্ষক।
- **ধৈর্য (Patience) :** ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা নেতার একটি অপরিহার্য গুণ। প্রতিকূল পরিবেশে নেতা যদি ধৈর্যের পরিচয় দিতে না পারে, তবে তার পক্ষে অনুসারীদের সঠিক পথে পরিচালনা করা কখনোই সম্ভব হবে না। অধস্তনরা যে সবসময়ই কাজক্ষিত আচরণ করবে, এমনও নয়। সেক্ষেত্রে তা সংশোধনের জন্য, নেতাকে ধৈর্যের সাথে উদ্যোগী হতে হয়।
- **পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতা (Hard Work and Endurance) :** একজন নেতাকে পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু হতে হয়। তাই নেতা যদি অলস হন, কাজ না করে, অলসেই ভেঙে পড়ে, তবে তার পক্ষে অনুসারীদের সঠিকভাবে পরিচালনা সম্ভব হয় না। একজন নেতার সবসময় স্মরণ রাখা উচিত, 'Industry is the mother of good luck' অর্থাৎ পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।
- **ন্যায়পরায়ণতা (Uprightness) :** একজন নেতার অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যিক। অধস্তনদের মাঝে যদি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয় বা সবাইকে সমান নজরে দেখতে না পারে, তবে নেতার পক্ষে কার্যকর নেতৃত্বদান কখনই সম্ভব হবে না। ন্যায়পরায়ণতার গুণ অধস্তনদের মাঝে নেতার গ্রহণযোগ্যতা ও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

- **সততা ও আন্তরিকতা (Honesty and Sincerity) :** একজন নেতার অবশ্যই সৎ, বিশ্বস্ত এবং কাজের প্রতি আন্তরিক হওয়া আবশ্যিক। নেতার মধ্যে যদি কপটতা থাকে, নেতা নিজেই যদি দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে অধস্তনরা তার প্রতি কখনোই শ্রদ্ধাশীল হতে পারে না। নেতাকে মনে রাখা আবশ্যিক যে, ‘Devotion to work leads man to the pinnacle of glory’ অর্থাৎ কাজের প্রতি নিষ্ঠাই একজন মানুষকে বিজয়ের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দেয়।
- **যোগাযোগের নৈপুণ্য (Communication Skill) :** যোগাযোগের নৈপুণ্য নেতার আরও একটি অপরিহার্য গুণ। নেতা তার চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, আদেশ-নির্দেশ যতটা সহজ ও সুন্দরভাবে অধস্তনদের জানাতে পারবেন, তাদের কাছ থেকে ঠিক ততোটাই অনুকূল সাড়া লাভ করতে পারবেন।
- **সামাজিক নৈপুণ্য (Social Skill) :** নেতাকে সমাজের বিভিন্ন মানুষের সাথে মিশতে হয়। তাই নেতার মাঝে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে সহজে মেশার গুণ থাকা আবশ্যিক।
- **সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (Ability to take decision) :** সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর সাফল্য নির্ভর করে। নেতা বা নির্বাহী যদি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তবে অধস্তন জনশক্তিকে কখনোই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।
- **উৎসাহদানের ক্ষমতা (Ability to inspire) :** নেতার কাজ হলো অধস্তনদের চিন্তা ও চেষ্টাকে লক্ষ্যপানে পরিচালিত করা। এরূপ পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতার মাঝে কর্মীদের মনে উৎসাহ সৃষ্টির গুণ থাকা আবশ্যিক।
- **অনুসন্ধিৎসু মন (Inquisitive Mind) :** একজন নেতার অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী হওয়া আবশ্যিক। এরূপ অনুসন্ধিৎসু মন বলতে প্রকৃত তথ্য জানার আগ্রহ ও নতুনত্ব প্রবর্তনের প্রয়াসকে বোঝায়।
- **বিশ্লেষণের ক্ষমতা (Ability to Analyze) :** একজন নেতার পক্ষে সকল ঘটনা, কথা ও কাজকে নিজের আঙ্গিকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য। নেতা বা নির্বাহী অন্যের কথা শুনবেন ঠিকই, কিন্তু নিজ মেধাশক্তি দিয়ে ঘটনা বিশ্লেষণে ব্যর্থ হলে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মপন্থা অবলম্বন সম্ভব হয় না।
- **প্রজ্ঞা (Foresightness) :** একজন নেতাকে অবশ্যই প্রজ্ঞাবান বা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক। অতীত ও বর্তমানকে বিবেচনা করে তিনি যদি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না।

নেতৃত্বের দায়িত্ব

প্রখ্যাত মার্কিন সংগীতজ্ঞ জো ব্যাটেন (১৯৪২-বর্তমান)-এর মতে,

‘নেতার প্রথম কাজ হচ্ছে আশা (প্রত্যাশা বা স্বপ্ন)-কে জীবন্ত রাখা।’

নেতৃত্ব মূলত নেতার কার্যাবলি ও দায়িত্বের সমষ্টি। একজন নেতার বহুমুখী দায়িত্ব পালন করতে হয়। পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপটভেদে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন : ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক, পেশাগত ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব : একজন ব্যক্তির পারিবারিক পটভূমি যত নগণ্যই হোক না কেন তা নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগার কোনো অবকাশ নেই। ব্যক্তি তার সততা, শিক্ষা ও দক্ষতার মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন করে সকলের নিকট সম্মানিত হতে পারে; পারে আদর্শ নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। একজন নেতার ব্যক্তিগত দায়িত্বগুলো হচ্ছে—

- সকলের সাথে অমায়িক ব্যবহার করা
- সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়া
- শৃঙ্খলাবদ্ধতা রক্ষা করা
- ত্যাগী মনোভাবের অধিকারী হওয়া
- গর্ব-অহংকার মুক্ত হওয়া
- কথা ও কাজে সামঞ্জস্যতা রাখা
- আত্মসমালোচনা করা
- পরিকল্পিত জীবনযাপন করা।

ব্যক্তির নিজের প্রতি দায়িত্ব : নিজের প্রতি দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ—

- নিজের ব্যক্তিত্বকে অটুট রাখা
- বাস্তবসম্মত ঝুঁকি গ্রহণ করা
- নিজেকে যথোপযুক্তভাবে গড়ে তোলা
- ক্ষতিকর আত্মসমালোচনা না করা
- দায়িত্বের সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- অপরের প্রতি ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যবহার
- নিজের কার্যকলাপের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

কাজের প্রতি দায়িত্ব : নেতার কাজের প্রতি যে দায়িত্ব তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

- সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উদ্দেশ্য অর্জনে সঠিকভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া।
- ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসমূহকে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যের সাথে একত্রিত করা।
- কাজকে অধিক অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক করে তোলা।
- কার্যপদ্ধতি সহজকরণ।
- অপ্রয়োজনীয় সকল প্রকার জটিলতা বর্জন করা।
- কাজে অগ্রগতির প্রতি নজর রাখা।

- কাজের প্রতি শিথিলতা না দেখানো।
- কাজ সম্পর্কে কর্মীকে অবগত করানো।
- কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার পথ বাছাই করা।

পারিবারিক দায়িত্ব : একজন মানুষ তার বেড়ে উঠা এবং প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে তার পরিবার থেকে। তাই একজন নেতা পরিবারের প্রতি দায়িত্বগুলো কখনোই এড়াতে পারে না। সকল ধর্মে পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষা ও দায়িত্ব পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পরিবারের প্রতি একজন নেতার দায়িত্বগুলো হলো :

- মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব
- আত্মীয়স্বজনদের প্রতি দায়িত্ব
- প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব
- বড়োদের সম্মান ও ছোটোদের স্নেহ
- ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্ব।

সামাজিক দায়িত্ব : সামাজিক জীব হিসেবে প্রতিটি মানুষেরই সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। একজন নেতাকেও সমাজের কল্যাণ সাধনে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। সমাজের পৃথক পৃথক পক্ষের প্রতি একজন নেতার যে সকল দায়িত্ব রয়েছে, সেগুলো হলো—

- এলাকার প্রতি দায়িত্ব
- জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ব
- অন্যান্য সংগঠনের প্রতি দায়িত্ব
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ব
- ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ব।

সংগঠন/ প্রতিষ্ঠানের প্রতি দায়িত্ব : প্রতিষ্ঠানের প্রতি নেতার দায়িত্ব নিম্নরূপ :

- সংগঠনের সার্বিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ ও পূর্ণ সমর্থন প্রদান
- সংগঠনের মৌলিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অবগত হওয়া
- সাংগঠনিক কাজে বেশি সময় ব্যয় করা
- সাংগঠনিক স্বার্থ রক্ষায় নিজেকে সর্বদা মনোযোগী করা
- সংগঠনের প্রতি অন্যদের মনোযোগ বৃদ্ধি করা
- সংগঠনের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন
- নেতিবাচক মন্তব্য না করা
- সংগঠনের কল্যাণ সম্পর্কিত সৎ ও ইতিবাচক বিষয় বর্ণনা করা
- উচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

পেশাগত দায়িত্ব : একজন নেতা পেশাগত দায়িত্ব পালনে সর্বদাই বাধ্য থাকেন। কেননা, এর জন্য তিনি আর্থিক প্রণোদনা পেয়ে থাকেন। অপরদিকে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে নেতার সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। মূলত, নেতার ওপরেই সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সফলতা ব্যর্থতা নির্ভর করে।

নেতৃত্বের মূলনীতি

ব্রাড সুগার নেতৃত্বের নিম্নোক্ত মূলনীতিসমূহ উপস্থাপন করেছে (Sugars, 2015) :

- **নিজেকে জানা এবং আত্ম-উন্নতির চেষ্টা করা :** নেতৃত্বের অন্যতম মূলনীতি হলো নিজেকে আবিষ্কার করা, নিজের গুণাবলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা এবং আত্মপরিবর্তনের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মূলত অন্যদের সাথে যোগাযোগ, নিয়মিত ক্লাস, এসবের মাধ্যমে নেতৃত্বের অনুধাবন আরও অনেক বেশি যোগ্যতর হয়ে ওঠে।
- **জানার ক্ষেত্রে কৌশলী হওয়া :** একজন নেতা কর্মী এবং কর্মচারীদের সম্পর্কে অবশ্যই অবগত থাকবেন এবং যাবতীয় বিষয়াদি জানার চেষ্টা করবেন। তবে এ ক্ষেত্রে নেতা অবশ্যই কৌশলী হবেন।
- **নিজের ভুলের দায় নেওয়া :** অন্য যেকোনো পন্থার চেয়ে হান্ট ডাউন পন্থা সবচেয়ে ভালো। এই পদ্ধতি মূলত ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করে এবং পারস্পরিক দোষারোপ থেকে বিরত রাখে।
- **সময়মত সিদ্ধান্ত নেওয়া :** সময়মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে চিন্তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। মার্কিন সেনাবাহিনীর সাবেক জেনারেল, জেনারেল জর্জ প্যাটন (১৮৮৫-১৯৪৫) বলেন- আজকের সুন্দর ব্যবস্থাপনা আগামীকালের (বিলম্বিত) নিখুঁত আয়োজনের চেয়ে উত্তম।
- **উদাহরণ সেট করা :** কর্মীদের জন্য নেতাকে ভালো মানের মডেল হতে হবে। কেবল কী করতে হবে, এই গাইডলাইন দেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং নিজ কর্মে এমন উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে, যা দেখে কর্মীরা অণুপ্রাণিত হবে।
- **কর্মীদের অবগত রাখা :** প্রতিষ্ঠানের কাজের বর্তমান অবস্থা কর্মীদেরকে জানানো দরকার। এতে করে তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে ভাবতে শুরু করে।
- **কর্মীদের সুসমন্বিত দলে পরিণত করা :** কর্মীদেরকে একটা টিমে পরিণত করা নেতার অন্যতম দায়িত্ব। যাতে করে প্রত্যেকে তার নিজ জায়গা থেকে লক্ষ্য অর্জনে স্বপ্রণোদিত হয়।
- **পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করা :** কর্মীদের মাঝে টিমস্পিরিট সৃষ্টির মাধ্যমে, নেতা প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের মধ্যে পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন।

নেতৃত্বের দক্ষতার ব্যবহার

অতীতে নেতার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলিকে নেতৃত্বের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু বর্তমানে কার্যকর নেতৃত্বের জন্য নেতার আচরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অর্থাৎ সফল নেতৃত্ব ব্যক্তির গুণাবলির ওপর নির্ভর করে না; নির্ভর করে যথোপযুক্ত আচরণ, দক্ষতা ও কাজের ওপর। Robert H. Ketz-এর মতে, একজন নেতা তিনটি ভিন্ন ধরনের দক্ষতা ব্যবহার করে থাকেন। যেমন :

- কারিগরি দক্ষতা (Technical Skills)
- মানবীয় দক্ষতা (Human Skills)
- ধারণাগত দক্ষতা (Conceptual Skills)

কারিগরি দক্ষতা (Technical Skills) : কারিগরি দক্ষতা বলতে ব্যক্তির যেকোনো ধরনের প্রক্রিয়া বা কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান বা যোগ্যতাকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ হিসাব বিজ্ঞানী, কমপিউটার বিজ্ঞানী, প্রকৌশলীর কথা বলা যায়। এসব পেশাদার ব্যক্তিদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কারিগরি দক্ষতা বলা হয়। এই দক্ষতাগুলো চাকরির শুরুতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মানবীয় দক্ষতা (Human Skills) : কর্মীর সাথে নেতা কার্যকরভাবে কাজ করে, দলীয় কার্য সম্পাদন করার যোগ্যতাকে মানবীয় দক্ষতা বোঝায়। উচ্চপদস্থ নেতাদের সাথে নিম্নপদস্থ কর্মীদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং এর ইতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে অনুধাবন করাকে মানবীয় দক্ষতা বলে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য এই ধরনের যোগ্যতা খুব বেশি প্রয়োজন।

ধারণাগত দক্ষতা (Conceptual Skills) : এই ধরনের দক্ষতা একটি সমষ্টিগত ধারণা। সংগঠনের কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিল বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা করার যোগ্যতাই ধারণাগত দক্ষতা।

নেতৃত্বের বৈচিত্র্য

বস বনাম নেতা

বসের আচরণগুলো খেয়াল করলে তার মধ্যে স্বৈরাচারী নেতার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। বস সাধারণত অধীনস্থদের ভয় দেখায় বা অধীনস্থরা বসকে ভয় পায়। যদি অধীনস্থরা উর্ধ্বতনদের ভয় পায়, তাহলে বুঝতে হবে উর্ধ্বতনদের মধ্যে কিছুটা কৃতৃত্ব খাটানোর স্বভাব আছে। অন্যদিকে নেতা ভয় দেখান না। অধীনস্থরা নেতাকে ভয় পায় না। বস অধীনস্থদের তাড়িয়ে বেড়ায়, কে কখন কোথায় কী করছেন তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে। অপরদিকে সময়মতো মানসম্পন্ন কাজ হচ্ছে কি না তা নিয়েই নেতার মাথা ব্যাথা। বস কথায় কথায় ‘আমি আমি’ করে। অন্যদিকে, নেতার মুখে ‘আমরা’ শব্দটা বেশি শোনা যায়। বসের অন্যতম প্রধান দুটো আচরণ হচ্ছে, কোনো সমস্যা হলে এর জন্য দায়ী কে বা কাকে দায়ী করা যায় তা নির্ধারণ করতে গলদঘর্ম হওয়া। আর কোনো কাজ বা প্রকল্প সফল হলে প্রাপ্যের চেয়ে বেশি কৃতিত্বের দাবি করা। অন্য দিকে, নেতা সমস্যার কারণ এবং সমাধান খোঁজ করে। সফল কাজের কৃতিত্ব নিজের কাঁধে নেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠে না। বস অধীনস্থের ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন চিন্তা করে না। অন্যদিকে নেতা অধীনস্থের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

বস যেহেতু অধীনস্থের ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন ভাবে না, তাই তাকে যত দ্রুত সম্ভব ছেড়ে যাওয়াই ভালো; অন্য পদে বা অন্য চাকরিতে।

নেতা	বস
অধীনস্থদের কাজের জন্য অনুপ্রাণিত করে	অধীনস্থদের নির্দেশ দেয়
নেতৃত্ব টিকে থাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের ওপর ভিত্তি করে	কৃতৃত্বের মাধ্যমে নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখে
কর্মীদের মানোন্নয়নে সচেষ্ট থাকে	মানোন্নয়নের বদলে আদেশ দিতেই পছন্দ করে
অধস্তনদের সার্বিক ভালো মন্দের প্রতি যত্নশীল	অধস্তনদের উৎপাদনশীলতাই বসের মুখ্য উদ্দেশ্য।
সবসময় ‘আমরা’ ব্যবহার করে	‘আমি’ ব্যবহারে অভ্যস্ত
স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করিয়ে নেয়	ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজ করিয়ে নেয়
সফলতা দলের সবার মাঝে ভাগ করে দেয়	সফলতার ক্রেডিট নিজেই নিতে চায়
সবসময় দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা ও পরিকল্পনা করে	স্বল্পমেয়াদি চিন্তা-ভাবনা করে
কর্মীরা এই ধরনের নেতৃত্ব পছন্দ করে।	এই ধরনের নেতৃত্ব অধস্তনরা অপছন্দ করে
সামনে থেকে কর্মীদের নিয়ে কাজ পরিচালনা করে।	পেছন থেকে শুধু আদেশ দিয়ে থাকে

সফলতা ভবিষ্যদ্বাণীর ওপর নির্ভর করে	সফলতা আবিষ্কারের ধরন অনুযায়ী নির্ভর করে
মান নিয়ন্ত্রণ করে	প্রত্যেকে মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী
নেতা হলো স্থপতি	ম্যানেজার হলো নির্মাণকারী
নেতৃত্ব পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করতে হয়	ব্যবস্থাপনা জটিলতার সঙ্গে মোকাবিলা করা হয়

বস হচ্ছে স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের প্রতিমূর্তি। বস ও নেতা উভয়েই প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে আধুনিককালে বসের চেয়ে নেতা অধিক জনপ্রিয় একটি শব্দ।

৩৬০ ডিগ্রি নেতৃত্ব

সাধারণত নেতৃত্ব মানেই কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের শীর্ষস্থানকে বোঝায়। শীর্ষস্থানে যিনি থাকেন তিনিই নেতা এবং শীর্ষস্থানে না থাকলে নেতৃত্ব দেওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব হচ্ছে মানুষকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা বা দক্ষতা। সমস্ত নেতৃত্বের অর্ধেক বা তারও বেশি আসে একটি প্রতিষ্ঠানের মাঝখান থেকে, শীর্ষ পর্যায় থেকে নয়। দক্ষতা থাকলে ওপরের, নিচের, পাশের লোকদের প্রভাবিত করা যায়, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করা যায়। ৩৬০ ডিগ্রি লিডারের লেখক (The 360-Degree Leader) জন সি ম্যাক্সওয়েল (John C. Maxwell) ব্যাখ্যা করেন, নীতিগত নেতারা প্রতিষ্ঠানের যেকোনো জায়গা থেকে নেতৃত্ব দিতে পারে এবং স্বল্প কিংবা পরিসরেও প্রভাব খাটাতে পারে।

অধস্তনদের নেতৃত্ব দেওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ। এদের সামনে নিজেকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে, কার কী যোগ্যতা বা সুপ্ত প্রতিভা আছে তা বুঝে সেই অনুযায়ী কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করতে হবে এবং লক্ষ্য অর্জন হলে কার কী লাভ, তা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে।

মূল ধারণা (Key Concepts)

জন সি ম্যাক্সওয়েল Maxwell (2011) সংগঠনের প্রতিটি পর্যায়ে এবং নেতাদের মূল্য ও প্রভাব আনতে সাহায্য করার জন্য তিনটি নীতির বর্ণনা দেন :

১. **লিড-আপ (Lead-Up)** : লিড-আপ হলো একজন নেতার প্রভাবিত প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন নেতা কী করবে, কখন করবে অন্যরা কী করবে না তা জানতে চাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে।
২. **লিড-এক্সেস (Lead-Across)** : একটি সংগঠনের নেতৃস্থানীয় নেতাদের নেতা। নেতাদের ইতিবাচক ফলাফল অর্জন, সহকর্মীদের সাহায্য, সেবা ধারণা জন্ম, পারস্পরিক মর্যাদা, সম্মান, নেতাদের বিকাশ এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার প্রভাব অর্জন করা।

৩. **লিড-ডাউন (Lead-Down)** : শীর্ষ নেতার নেতৃত্ব দ্বারা মানুষকে তাদের সম্ভাব্যতা বোঝাতে সহায়তা এবং একটি শক্তিশালী ভূমিকায় মডেল হয়েও অন্যদেরকে উচ্চতর উদ্দেশ্যের অংশ হিসেবে উৎসাহিত করতে সহায়তা করাকে বোঝায়।

নেতৃত্ব এবং আবেগ

আবেগকে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। আবেগকে অনেকে অনুভূতির সমার্থক ধরে নেয়। যদিও অনুভূতি শারীরিক/মানসিক দুইই হতে পারে; আবেগ মূলত মানসিক। এটা এমন একটি মানসিক অবস্থা যা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উদ্ভূত হয়, সচেতন উদ্যম থেকে নয়। এর সাথে মাঝে মাঝে শারীরিক পরিবর্তনও প্রকাশ পায়। সেক্ষেত্রে আবেগকে বলা যায় অনুভূতির উৎস। আবার শারীরিকভাবে বলতে গেলে মসৃণ পেশি এবং বিভিন্ন গ্রন্থির কারণে শরীরের অন্তর্নিহিত পরিবর্তনই হলো আবেগ। সামগ্রিকভাবে চেতনার যে অংশ অনুভূতি বা সংবেদনশীলতার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত তাকে আবেগ বলা যায়।

আবেগ (Emotion) শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Emovere থেকে। Morgan & King-এর মতে, আবেগ-এর ৫টি উপাদান থাকা দরকার। সেই উপাদানগুলো হচ্ছে :

১. আবেগের মানসিক বা আত্মনিষ্ঠ অনুভূতি।
২. শারীরিক উত্তেজনা
৩. শরীরবৃত্তীয় ভিত্তি
৪. মৌখিক, ভাষাগত এবং অঙ্গ সঞ্চালনমূলক বহিঃপ্রকাশ
৫. সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষণামূলক অবস্থা।

নেতৃত্বকে একটি বিশেষভাবে আবেগবহুল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়। মানুষের আবেগ তাঁর নেতৃত্বকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। যে দলের নেতার মেজাজ ইতিবাচক সেই দলের সদস্যরা, যে দলের নেতার মেজাজ নেতিবাচক সেই দলের সদস্যদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে ভালো পারফর্ম করে। সকল মানুষের ভেতরই আবেগ কাজ করে। নেতার মধ্যেও আবেগ থাকা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তবে নেতাকে এই আবেগ অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আবেগহীনতা বা অতি আবেগ কোনটাই নেতৃত্বের জন্য সুখকর নয়। উভয়টিই নেতার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে একজন নেতাকে সুকৌশলে কর্মীদের মাঝে আবেগের সঞ্চারণ করতে হবে। অসাধারণ দক্ষতাসম্পন্ন নেতারা যেসব মনস্তাত্ত্বিক কৌশলের মাধ্যমে অনুগামীদের প্রভাবিত করে, তার মধ্যে আবেগের সঞ্চারণ অন্যতম। নেতার আবেগপূর্ণ মনোভাব দলের প্রতিটি সদস্যের মাঝে প্রসারিত হয় এবং তাদের মাঝে এক শক্তিশালী বন্ধন তৈরিতে সাহায্য করে।

নেতারা মেজাজের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং মনোভাবের সংকেত প্রকাশ করে থাকে। আবেগ একজন নেতাকে এমন মনোভাব প্রকাশ করতে সাহায্য করে যা খুব সহজে কথায় বা লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভবপর হয় না। অতএব, নেতৃত্ব প্রক্রিয়ায় আবেগ হচ্ছে অপরিহার্য উপাদান।

মানুষের কথা, লেখনী, অঙ্গভঙ্গি, মুখের অভিব্যক্তি, ইশারা-ইঙ্গিত, শারীরিক ভাষা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায় আবেগ। নিজের আবেগকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এবং অধস্তনদের মাঝে পরিমিত আবেগের প্রসারণ করলে তা একজন নেতার নেতৃত্বকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে।

গোল্ডেন রুল (Golden Rule)

গোল্ডেন রুল হচ্ছে, ‘Do unto others as you would have them do unto you.’ অর্থাৎ ‘অন্যদের প্রতি এমন আচরণ করুন, যে আচরণ আপনি তাদের থেকে প্রত্যাশা করেন।’ অনুমান করা হয়ে থাকে যে, এ Golden Rule-এর ধারণা প্রথম দিয়েছেন হজরত ইসা (আ.)। নিউ টেস্টামেন্টে এই নীতিটি দেখতে পাওয়া যায়। তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে একদল খ্রিস্টীয় ধর্ম প্রচারকের কল্যাণে এই ধারণাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীকালে এই ধারণাটি ইসলাম, ইহুদি, জৈন, হিন্দু, বৌদ্ধ, কনফুসিয়াসসহ অনেক ধর্মেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্বের একটি ধারণা হিসেবে এই নীতিটি অধিক পরিচিত। গোল্ডেন রুলের মূলকথা হচ্ছে—

- একজন লোক অন্যদের প্রতি যে আচরণ প্রত্যাশা করে তার সেই আচরণ করা উচিত।
- এমন আচরণ করা উচিত নয়, যা ব্যক্তি নিজে অপছন্দ করে।
- ব্যক্তি নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপরের জন্যও তা পছন্দ করবে।

হজরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বাণীতেও এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেন—

তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে। সহিহ বুখারি- হা : নং ১২

রাসূল (সা.)-এর জীবনীতেও এই নীতির বাস্তবায়ন দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ধনী-গরিব, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের সাথেই উত্তম আচরণ করতেন। এমনকী চরম দুশমন এবং খারাপ আচরণকারীর সাথেও তিনি নম্র ব্যবহার করতেন। দান-খয়রাতের ক্ষেত্রেও তিনি উত্তম অংশ থেকেই দান করতেন।

সুতরাং একজন আদর্শ নেতার সবসময় গোল্ডেন রুল অনুসরণ করা উচিত; অনুসারীদের নিকট থেকে যেমন আচরণ প্রত্যাশা করবে, তাদের সাথে তেমন আচরণই করতে হবে। যে আচরণ অপছন্দ করবে, নিজেও সেই আচরণ করা থেকে বিরত থাকবে।

স্যান্ডউইচ-সমালোচনা নীতি

একজন নেতার মূল কাজ হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনে অনুসারী-কর্মীদের পরিচালিত করা। এ ক্ষেত্রে কখনও কখনও ভুলগুলো শুধরে দেওয়ার জন্য তাদের সমালোচনা করার প্রয়োজন পড়ে।

কিন্তু অনেক কর্মীই সমালোচনাকে ইতিবাচকভাবে নিতে পারে না। তাই নেতাকে সমালোচনা করার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করা উচিত। এ ধরনের একটি কৌশল হচ্ছে সমালোচনার স্যান্ডউইচ অ্যাপ্রোচ।

স্যান্ডউইচ অ্যাপ্রোচ হচ্ছে কারও সমালোচনা ক্ষেত্রে সমালোচনার পাশাপাশি প্রশংসা করা। স্যান্ডউইচ অ্যাপ্রোচকে অনেকে Hamburger Approach-ও বলে থাকে। কারও সমালোচনা করার উত্তম পদ্ধতিগুলোর একটি হচ্ছে আপনি যার সমালোচনা করতে যাচ্ছেন, প্রথমে তার অনেকগুলো ভালো দিক বলুন বা তার অনেক প্রশংসা করুন। তারপর তার অল্প কিছু গঠনমূলক সমালোচনা করুন। যেমন ধরুন, কেউ যদি আপনার ১০টি ভালো দিক বলে এবং শুধু একটি সমালোচনা করে তাহলে কোনটি আপনার বেশি সময় ধরে মনে থাকবে? অবশ্যই সমালোচনাটিকেই আপনি বেশি সময় ধরে মনে রাখবেন।

পেরেটো ৮০/২০ নীতি

ইতালীয় অর্থনীতিবিদ Pareto (1896) সালে University of Lausanne-তে তাঁর প্রথম প্রকাশিত পেপারে দেখিয়েছেন যে ইতালির ৮০% ভূমির মালিক ২০% জনগণ। তাঁর দেশের ২০ শতাংশ লোক দেশের মোট সম্পত্তির ৮০ শতাংশ দখল করে আছে। পরবর্তী সময়ে প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনা পরামর্শক Joseph M. Juran ১৯৪১ সালে Vilfredo Pareto-এর ধারণাকে নিয়ে গবেষণা করেন এবং তাঁর এই ধারণাকে Principle-এ রূপ দান করেন। তিনি প্রমাণ করেন, যেকোনো কাজের ৮০ ভাগ আউটপুট মাত্র ২০ ভাগ লোকের ওপর নির্ভর করে। বাকি ৮০ শতাংশ লোকের প্রচেষ্টায় ২০ শতাংশ ফলাফল এসে থাকে। তিনি তার এই ধারণাকে Vilfredo Pareto-এর নামানুসারে Pareto Principle নামকরণ করেন। এই থিওরির সাথে ৮০ এবং ২০ এই সংখ্যা দুইটির সম্পর্ক থাকায় একে ৮০/২০ Rule বা ৮০/২০ নীতিও বলা হয়। আধুনিককালে এই নীতি এতটাই জনপ্রিয় হয় যে, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সফটওয়্যার, খেলাধুলা, গণিতসহ আরও অনেক ডিসিপ্লিনে এই ধারণার সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। পেরেটো নীতি-এর মূল কথা হচ্ছে—

- ৮০% সফলতা আসে ২০% কর্মীর কাজের জন্য।
- ৮০% কাজ সম্পন্ন হয় ২০% লোকের মাধ্যমে।
- ৮০% ব্যর্থতার জন্য ২০% লোক দায়ী।

এই থিওরি সকল ক্ষেত্রেই দৃঢ়ভাবে ৮০/২০-এর নিয়ম মেনে চলবে এমনটা জরুরি নয়; বরং এই থিওরির সবচেয়ে বড়ো অনুধাবন হচ্ছে জীবনের সবকিছু সমানভাবে চলে না।

একজন নেতার নেতৃত্বকে আরও কার্যকর করার জন্য Pareto Principle খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি। কোনো দল বা সংগঠনের সকল কর্মী-অধীনস্থরা কখনই সমানভাবে দলের সাফল্যে অবদান রাখবে না। এই বিষয়টি নেতাকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। কোনো কর্মীর উৎপাদনশীলতা ও কর্মদক্ষতা কেমন এই বিষয়টি মাথায় রেখেই নেতার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত এবং কর্মীদের প্রতি সেভাবেই আচরণ করা উচিত।

নেতৃত্বের দক্ষতা বাড়াতে TAP নীতি

আপনি কি আপনার সব অজ্ঞতা ও হতাশাকে নেতৃত্ব বিকাশের জন্য অন্তরায় হিসেবে দেখছেন? যদি তাই হয়, নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে আপনি সহজ কিন্তু গভীর নতুন অন্তর্দৃষ্টি বিবেচনা করতে পারেন। নেতৃত্ব এমন একটি বিষয়, যা সকল পর্যায়ের সকল মানুষেরই প্রয়োজন। তাই সকলেরই নেতৃত্ব প্রদানে দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। অনেক গুণাবলি রয়েছে, যা নেতৃত্ব প্রদানে দক্ষ হতে সাহায্য করে। এর মধ্যে তিনটি গুণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- বিশ্বাস (Trust), জবাবদিহিতা (Accountability) ও আবেগ (Passion)। এই তিনটি গুণাবলির আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত হয়েছে TAP।

১. **আস্থা (Trust)** : বিশ্বাস বা আস্থা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে আশাবাদী করে তোলে। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে- ‘বিশ্বাসে মেলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।’ বিশ্বাস এবং আস্থার মাধ্যমেই নেতা অনুসারীদের কাছাকাছি আসতে পারে এবং ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে। এজন্য Stephen M. R. Covey বলেন, ‘Trust হচ্ছে এমন জিনিস যা সবকিছুই পরিবর্তন করে দেয়।’
২. **দায়িত্ব (Accountability)** : দায়িত্ব শ্রেষ্ঠত্ব ও জবাবদিহিতা প্রমাণিত করে। দক্ষ নেতৃত্ব তৈরিতে দায়িত্ব অন্যতম গুণ। এটি নেতৃত্বের মাঝে জবাবদিহিতার অনুভূতি তৈরিতে সাহায্য করে। দায়িত্বের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে Zig Ziglar বলেন, ‘আপনি যা প্রত্যাশা করবেন সে বিষয়ে আপনার অবশ্যই তদারকি করতে হবে।’
৩. **আবেগ (Passion)** : আবেগ উজ্জ্বলতা জাগিয়ে তোলে। যেকোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করার প্রথম শর্ত হচ্ছে ওই কাজ বা বিষয়ের প্রতি Passion বা আবেগ, অনুভূতি থাকা। ভালোবেসে কেউ কাজ করলে সফল হবেই। Passion সম্পর্কে Ken Blanchard বলেন, ‘কোনো সংগঠনই নেতার আবেগের উর্ধ্বে উঠতে পারে না।’

৭০-২০-১০-এর নীতি

আধুনিক যুগে জনপ্রিয় নীতিগুলোর অন্যতম হলো The ৭০ : ২০ : ১০ Model for Learning and Development বা শিক্ষা এবং উন্নয়নের ৭০-২০-১০-এর নীতি। এই নীতি অনুযায়ী মানুষ তার জ্ঞানের ৭০ ভাগ শিখে কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা থেকে। ২০ ভাগ শিখে সমাজের অপর মানুষদের সাথে মিশে এবং অন্যদের দেখে, আর ১০ ভাগ শেখে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে। বাই সাইকেল চালানো শিখতে চাওয়া দুই বন্ধুর একজনের সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়া এবং অন্যজন সাইকেল চালানো সংক্রান্ত বই পড়ার মধ্যে পার্থক্য যেমন, শুধু পুস্তক থেকে অর্জিত বিদ্যা এবং বাস্তব কর্মজগৎ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার পার্থক্যও তেমন।

এই নীতির ধারণা প্রথম দিয়েছেন Michael M. Lombardo এবং Robert A. (Eichinger and Morgan McCall (1980)) নামক তিনজন গবেষক। ১৯৮০ সালে Center for Creative Leadership নামক অমুনাফাভোগী শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণামূলক কাজ করতে গিয়ে তারা এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন। তাদের গবেষণা অনুযায়ী মানুষ তার মোট শিক্ষার-

- প্রায় ৭০% চাকরির অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার চ্যালেঞ্জিংয়ের মাধ্যমে অর্জন করে।
- প্রায় ২০% সম্পর্ক উন্নয়ন, নেটওয়ার্ক, এবং প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে।
- প্রায় ১০% আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করে।

পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্র থেকে অর্জিত শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সব সময়ই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর। সেজন্যই প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্পন্ন করার জন্য ন্যূনতম ৩ মাসের সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন (ইন্টার্ন) করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

মানুষের জ্ঞান অর্জনের এই তিনটি উৎস সম্পর্কে নেতা যদি স্পষ্টভাবে অবহিত থাকে, তাহলে খুব সহজেই নিজের এবং অনুসারীদের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

৯০/১০ নীতি

এই নীতি বর্ণনার আগে একটি কাল্পনিক ঘটনা বলা যাক। জনাব ওয়াহিদুর রহমান সকালের নাস্তা করছেন। কিছুক্ষণ পর অফিসে যাবেন। এমন সময় তার ৭ বছরের ছোটো মেয়ের হাত লেগে কফির কাপটি শাটে পড়ে গেল। এতে তিনি বেজায় চটে গেলেন এবং মেয়েকে বকাবকি করতে করতে ওয়াশ রুমে গিয়ে নিজের শাট ধুয়ে এলেন। এসে দেখলেন তার ছোটো মেয়ে কান্না করছে। বুঝিয়ে শুনিয়ে তাকে নাস্তা করাতে বেশ দেরি হয়ে গেল। তারপর তাকে স্কুলে দিয়ে নিজে অফিসে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, দেরি করে ফেলেছেন। অফিসে আজ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল। সেখানেও উপস্থিত হতে দেরি করে ফেলেছেন। ফলে অবধারিতভাবেই তাকে বসের বকা শুনতে হলো। এতে তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এর প্রভাব গিয়ে পড়ল তার অধস্তনদের ওপর। অধস্তনদের কাজে কোনো ভুল হলে তা সহজে বুঝিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তাদেরকে তিরস্কার এবং বকাঝকা করতে লাগলেন। ফলে অধস্তনরাও ভালোভাবে কোনো কাজ করতে পারল না এবং তারা তাদের বসের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলল। এতে কাজের সূষ্ঠা পরিবেশ বিঘ্নিত হলো এবং কোম্পানির উৎপাদনশীলতা ওই দিনের জন্য ব্যাহত হলো। এবার বলা যাক জনাব ওয়াহিদুর রহমানের চারপাশের অস্থিতিশীল পরিবেশের জন্য মূলত দায়ী কোন কাজটি?

১. ওয়াহিদুর রাহমানের অফিসে দেরি করে যাওয়া
২. অধস্তনদের বকাঝকা করা
৩. কফির কাপ পড়ে যাওয়া নাকি
৪. সকালে মেয়ের প্রতি তার ভুল প্রতিক্রিয়া।

সঠিক উত্তর হবে; সকালে মেয়ের প্রতি ভুল প্রতিক্রিয়া। সারা দিনে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলোর মূলে ছিল কফি পড়ে যাওয়ায় মেয়ের প্রতি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া।

পুরো ঘটনাটা আরেকবার একটু অন্যভাবে কল্পনা করা যাক। কফির কাপ পড়ে যাওয়ার পর জনাব ওয়াহিদুর রহমান যদি মেয়ের দিকে স্মিত হেসে বলতেন, ‘সবকিছু ঠিক আছে’ এবং তারপর নিজের শার্ট ধুয়ে আসতেন তাহলে পরিস্থিতি খুবই স্বাভাবিক থাকত। মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে নিজে সঠিক সময়ে অফিসে যেতে পারতেন এবং পরবর্তী ঘটনাগুলো অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক থাকত।

সুতরাং কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনার প্রতিক্রিয়া। আপনার এই প্রতিক্রিয়া শুধু ওই ঘটনার প্রতিই যে সীমাবদ্ধ থাকবে এমন নয়। পরবর্তী অন্যান্য ঘটনার ওপরেও এর প্রভাব থাকবে। আর এটিই হচ্ছে ৯০/১০ নীতির মূলকথা।

আমরা আমাদের জীবনের ১০% ঘটনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। বাকি ৯০ শতাংশ ঘটনাগুলো চাইলেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এগুলো মূলত প্রতিক্রিয়ার ফল। যেমন আপনার ফ্লাইট যদি লেইট হয় অথবা ট্রেন ছাড়তে দেরি করে তাহলে তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন তা হচ্ছে, ইমোশন বা প্রতিক্রিয়া। কোনো ঘটনা বা বিষয়ের প্রতি প্রতিক্রিয়াই দৈনন্দিন জীবনের ৯০ শতাংশ ঘটনার কারণ।

২০-৬০-২০ নীতি

২০-৬০-২০ নীতি সাধারণত ব্যবস্থাপনা তত্ত্বে ব্যবহার করা হয়। এর বেশিরভাগ অ্যাপ্লিকেশন মানুষের আচরণ বা পছন্দগুলোর সাথে সংযুক্ত। যখন লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো দল বা সংগঠন তৎপরতা চালায়, তখন দলের কর্মীদেরকে উৎপাদনশীলতা, কর্মস্পৃহা ওপর ভিত্তি করে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে ইতিবাচক, নিরপেক্ষ এবং নেতিবাচক। মোট কর্মীদের প্রায় ২০ শতাংশ প্রথম ভাগে, ৬০ শতাংশ দ্বিতীয় ভাগে এবং বাকি ২০ শতাংশ তৃতীয় ভাগে অবস্থান করে। নিম্নে প্রতিটি গ্রুপে অবস্থানকারী কর্মীদের সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা হলো :

- ১. ইতিবাচক গ্রুপ :** এটি এমন একটি গ্রুপ যা ইতিবাচকভাবে বিভিন্ন সমস্যাতে অবদান রাখে। এরা খুবই কর্মতৎপর; যেকোনো সমস্যা বা ইস্যুতে এ গ্রুপের কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। মোট কর্মীর আনুমানিক ২০ শতাংশ এই ইতিবাচক গ্রুপে অবস্থান করে।
- ২. নিরপেক্ষ গ্রুপ :** এই গ্রুপের প্রভাব অনিশ্চিত; গ্রুপে অবস্থানকারী কর্মীদের মাঝে গড়পড়তা কাজ করে। জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ এই ধাপে অবস্থান করে।
- ৩. নেতিবাচক গ্রুপ :** অফিস কিংবা দলের ভেতর এই গ্রুপের নেতিবাচক প্রভাব আছে। এরা মূলত আগের ২ প্রকার কর্মীদের তুলনায় কম কার্যকর এবং স্বল্প উৎপাদনশীল। মোট কর্মী সংখ্যার ২০ শতাংশকে এই গ্রুপের জন্য বিবেচনা করা হয়।

পিটার নীতি

Peter Principle বা পিটার নীতি বলতে এমন একটি ধারণাকে বোঝানো হয়, যেখানে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের নির্দিষ্ট পদে নেতৃত্ব বাছাই করার জন্য উক্ত পদের এক ধাপ নিচের পদে যারা অবস্থান করছে, তাদেরকে পদোন্নতির মাধ্যমে ওপরের পদে তুলে আনা হয়। এ ধরনের সংগঠন কাঠামোতে Organizational Hierarchy বা নেতৃত্বের ক্রম কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়।

Peter principle-এর মূল কথা হচ্ছে যোগ্য ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পদোন্নতি পেতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই পদের জন্য তার যথেষ্ট যোগ্যতা থাকে। যখন ব্যক্তি তার কার্যক্রম ও লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবে ঠিক তখনই পদোন্নতি বন্ধ হয়ে যাবে। ধরে নেওয়া হবে, ওই ব্যক্তি সেই নির্দিষ্ট পদের জন্য অযোগ্য।

Peter Principle-এর জনক হচ্ছে কানাডিয়ান শিক্ষাবিদ পিটার। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত The Peter Principle নামক বইতে এই নীতির কথা তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কোনো সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের যেকোনো স্তরের নেতার খুব ভালো পারফর্ম তার পদোন্নতিতে সহায়ক হয়। অথচ পদোন্নতির ক্ষেত্রে আগের সফলতা বিবেচনা না করে যে পদে পদোন্নতি দেওয়া হবে, সে পদের দায়িত্ব পালন করতে যে সকল গুণাবলি এবং দক্ষতা থাকা উচিত তা ব্যক্তির মাঝে আছে কি না তা যাচাই করা উচিত। যেমন একটি সংগঠনের জেলা পর্যায়ে পরিচালকদের মধ্যে যার পারফরম্যান্স সবচেয়ে ভালো তাকে জাতীয় পর্যায়ে পরিচালক নিযুক্ত করা হলো। এখন সেই পরিচালক যে তার সফলতা অব্যাহত রাখতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। হয়তো জাতীয় পর্যায়ে পরিচালনার দায়িত্ব পালনের জন্য অতিরিক্ত কিছু যোগ্যতা, দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার যা তার মাঝে নেই। ফলে জাতীয় পর্যায়ে ভালো পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে তিনি ব্যর্থ হতেই পারেন।

এই ধরনের পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কিছু পন্থাও বর্ণনা করে গেছেন Dr. Lavrance J. Peter. কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন করা, যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া, অতীত পারফরম্যান্স বিবেচনা না করে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা কর্মীর মাঝে আছে কি না তা যাচাই করা। এরকম কিছু পন্থা অবলম্বন করলে এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আলোচ্য বিষয় : অনেকে বলেন যে, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পিটার নীতির প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে, এতে ব্যক্তির গুণগত উৎকর্ষতার সম্ভাবনাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। অনেক ব্যক্তি ওপরে উঠার সাথে সাথে উৎকর্ষতা লাভ করে।

যাই হোক, কেউ কেউ বলেন যে উৎকর্ষতার সম্ভাবনাকে এরই মধ্যে বিবেচনায় আনা হয়েছে। উৎকর্ষতা যতক্ষণ হবে সে ততক্ষণ ওপরে উঠতে থাকবে।

আত্মোন্নয়নের জন্য তেলাপোকা তত্ত্ব

জার্মানির এক রেস্টুরেন্টে বসে বিকেলের ডিনার করছিলেন গুগলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (Chief Executive Officer-CEO) সুন্দর পিচাই (Sundar Pichai)। তাঁর পাশের টেবিলে কয়েকজন জার্মান মহিলা কফি এবং কেক খাচ্ছেন আর বেশ গাল-গল্প জুড়ে দিয়েছেন। হঠাৎ একটি তেলাপোকা উড়ে এসে এক ভদ্রমহিলার গায়ে পড়ল। ভদ্রমহিলা ভয়ে চিৎকার করা শুরু করলেন। মহিলা প্রচণ্ড শক্তিতে তেলাপোকাটাকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন। তেলাপোকা উড়ে এসে আরেক ভদ্রমহিলার গায়ে বসল। উনি মাত্র তার ডিংকসে চুমুক দিচ্ছিলেন। তেলাপোকা দেখে তিনিও বিকট চিৎকার জুড়ে দিলেন, ওয়েটার দৌড়ে এলো। এবার তেলাপোকাটি ওয়েটারের কাঁধে এসে বসল। ওয়েটার নিঃশব্দে বেশ কিছুক্ষণ তেলাপোকাটি পর্যবেক্ষণ করল। তারপর সে দু-আঙুলে ওটা ধরে রেস্টুরেন্টের বাইরে রেখে এলো।

এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে সুন্দর পিচাই-এর মনে ভাবান্তরিত হলো, জীবন কি এরকম নয়? তেলাপোকা মহিলাদের বিরক্ত করেছিল কিন্তু ওয়েটার নির্বিকার ছিল। কিন্তু কেন?

আপনার জীবনে সমস্যা আসবে আর আপনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া করবেন সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সাংসারিক জীবনে আসবে ঝড়, অপমান, দুঃখ কিন্তু আপনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া করবেন তাতেই নিহিত রয়েছে আপনার আত্মশক্তি। জার্মান সাইকোলজিস্ট Viktor Frankl বলেছেন : ‘Nicht das Problem macht die Schwierigkeiten, sondern unsere Sichtweise.’ অর্থাৎ ‘সমস্যা আপনার জীবনকে কঠিন করে না; বরং আপনি সমস্যাটিকে কীভাবে দেখেন সেটাই আসল কথা।’ মূলত প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত আছে আপনার সুখ।

এই তত্ত্ব থেকে শিক্ষণীয় দিক : আমাদের জীবনে প্রতিক্রিয়া করা উচিত নয়; সব সময় সাড়া দেওয়া উচিত। মহিলা যেখানে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল ওয়েটার সেখানে নির্বিকার ছিল। ওয়েটার ঘটনার প্রতি প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে বরং পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী সাড়া দিয়েছিল এবং সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করেছে।

একজন সফল নেতারও এই বিষয়টি মাথায় রাখা উচিত। প্রতিটি ঘটনায় সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। মনে রাখা উচিত, যে ব্যক্তি সুখী হয় তার জীবনের ঘটে যাওয়া সকল ঘটনাই যে স্বাভাবিক ছিল, এমনটি কখনই নয়; বরং সকল ঘটনার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক।

শ্রেষ্ঠত্বের জন্য উদ্বেগ্নতা

টম পিটারস এবং রবার্ট ওয়াটারম্যান-এর *In Search of Excellence* গ্রন্থটি ছিল সর্বকালের সবচেয়ে অধিক বিক্রিত ব্যবসায়িক বইগুলোর একটি। তারা এই বইতে শ্রেষ্ঠত্ব আন্দোলন নামে একটি জনপ্রিয় ব্যবস্থাপনা মতবাদ দিয়েছেন। এ মতবাদটি শ্রেষ্ঠত্বের উদ্বেগ্নতা (Concern for

Excellence) নামেও পরিচিত। তারা বইটিতে প্রাতিষ্ঠানিক সফলতার জন্য ৮টি পয়েন্ট নির্দেশ করেন, যা ব্যবসায়িক জগতে অত্যন্ত সমাদৃত হয়। তাদের মতে, কিছু প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ সফলতার ইতিহাস বজায় রাখার লক্ষ্যে এমন পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন করে, যার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় Peters and Waterman (1982)। পিটারস ও রবার্ট এইচ. ওয়াটারম্যান-এর মতানুসারে যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্য একটি প্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠত্ব দিতে পারে তা হলো :

১. সঠিক সময়ে কার্য সম্পাদন
২. কর্মীদের একেবারে কাছে অবস্থান
৩. উদ্যোগ গ্রহণ ও কর্ম স্বাধীনতার উন্নয়ন সাধন
৪. কর্মীদের উৎসাহ দানের মাধ্যমে সর্বাধিক ফলাফল অর্জন
৫. দক্ষতা অর্জনে বাস্তব পদ্ধতি গ্রহণ
৬. গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন
৭. সহজ সাংগঠনিক কাঠামো ব্যবহার করা এবং
৮. কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ উভয়েরই সমন্বিত উন্নয়ন সাধন।

তবে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা বিশারদ এই মতবাদটির সমালোচনা করেছেন এবং নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবস্থাপনা অধ্যয়নের চেষ্টা করেছেন। এ মতবাদের যথেষ্ট যৌক্তিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং প্রত্যেকেই লক্ষ্য অর্জনের পথে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, ব্যবস্থাপনার স্বরূপ বিশ্লেষণ ও অনুবোধনে আলোচিত প্রত্যেকটি মতবাদই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।